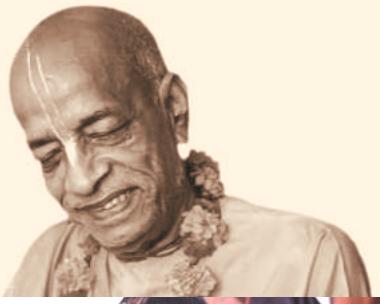


ভগবৎ-দর্শন

৪৬ তম বর্ষ ■ ৩য় সংখ্যা ■ মধুসূন ৫৩৬ ■ মে ২০২২



বিষয়-সূচী

ফলক

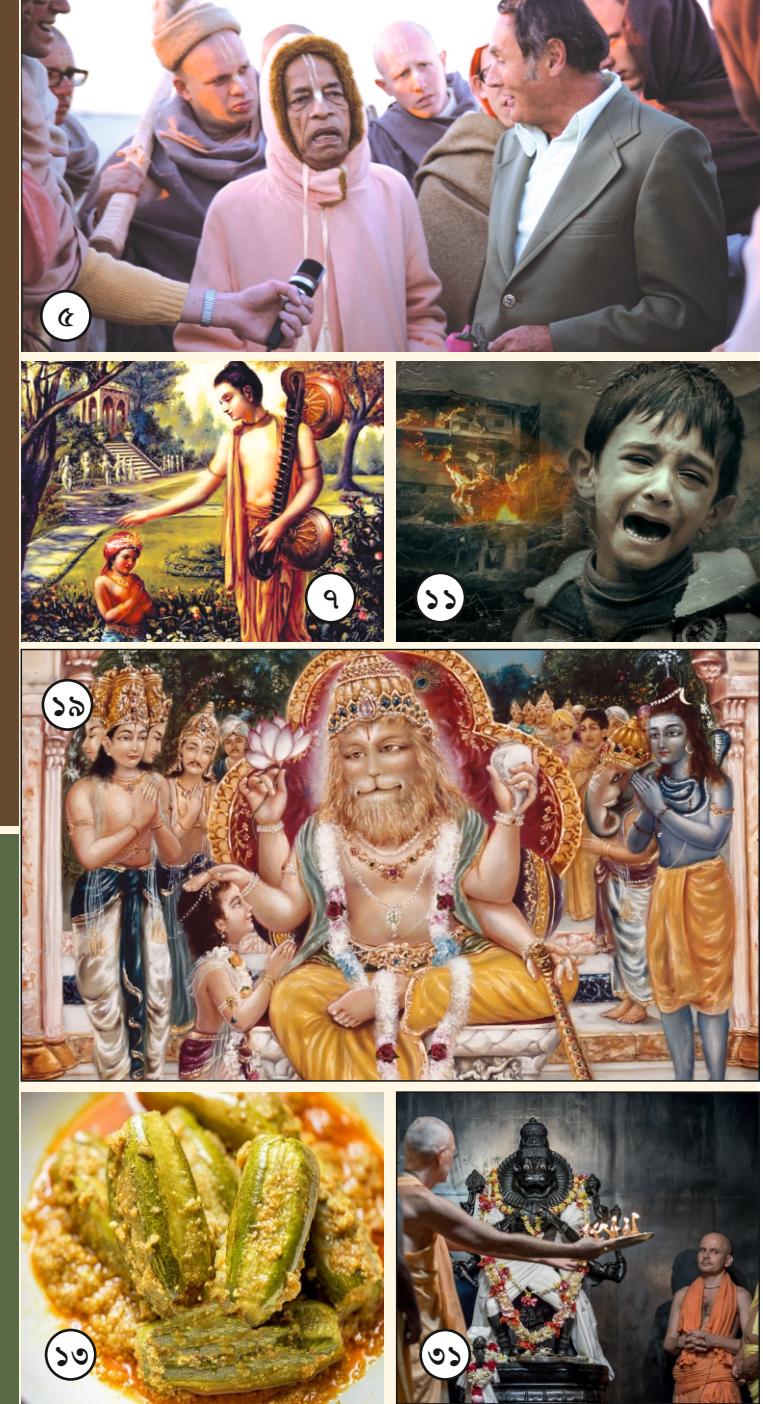
বিজ্ঞ

মুখ্যবৎ বাক্য প্রয়োগের স্বাধীনতা দিব্য জ্ঞান কি?	৩ ৬ ১০ ১৪ ১৬ ২০ ২৫
কৃষ্ণভাবনামৃত কি এই পৃথিবীকে উন্নত বাসস্থানে পরিণত করতে পারে?	

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক
আলোচনায় অর্জুনের চতুর্দশতম প্রশ্ন

ভগবৎসল ভগবান শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব
ব্রহ্মসংহিতা

শরণাগতি - কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়



আমাদের উদ্দেশ্য

- সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা।
- জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা।
- বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা।
- বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার।
- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা।
- সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আনন্দলনের পত্রিকা



প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণপাণ্ডীমুর্তি

শ্রীল অভ্যরণরবিদ ভক্তিবেদান্ত স্বামী পঞ্চপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনাময় সংখ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ
জ্যোতাকা স্বামী মহারাজ • সম্পাদক
শ্রীপাদ সনাতনগোপাল দাস • সহ-সম্পাদক
অরবিন্দ গোপাল দাস • সম্পাদকীয়
পরামর্শক পুরুষবোত্তম নিতাই দাস

- অনুবাদক স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি
মাধবীদেবী দাসী • প্রফুল্ল সংশোধক
সনাতনগোপাল দাস • ডিটিপি তাপস বেরা
- প্রচন্দ জহুর দাস • হিসাব রক্ষক গোবিন্দ
ধানুক • গ্রাহক সহায়ক পার্থপ্রাণ দাস ও চন্দ্ৰ
মাধব দাস • সূজনশীলন শুভজিৎ মোদক
- প্রকাশক ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
সত্যদর্শী নন্দন দ্বারা প্রকাশিত

অফিস অঞ্জনা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয়
রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা ৭০০০১৯,
মোবাইল ৯০৭৩৭৯১২৩৭

মেইলঃ btgbengali@gmail.com

বাংলারিক গ্রাহক ভিক্ষা

ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার (রেজিস্টারড ডাকঘোগে) ১ বছরের জন্য - ৬০০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ১২০০ টাকা • ভগবৎ-দর্শন (রেজিস্টারড ডাকঘোগে) ১ বছরের জন্য - ৫০০টাকা, ২ বছরের জন্য - ১০০০ টাকা • মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকঘোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাক্ষ অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।

অ্যাক্সিস ব্যাক্ষ (কোলকাতা প্রধান শাখা)

৭, শেঙ্গপুর সরণী, কোলকাতা
ব্যাক্ষ অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাক্ষ অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা
সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

আপনার প্রশ্নের শীৰ্ষ উত্তর পেতে হলে আপনার
সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি
আমাদের কাছে পাঠায়ে দিন। আটি সপ্তাহের মধ্যে
আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।



ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

বৃহৎ মৃদুস ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০২২ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

মস্পাদকীয়



প্রহ্লাদে বহু গুণবলী

প্রহ্লাদ কেন সর্বদাই ভয়হীন এবং আনন্দময়? হিরণ্যকশিপু, অত্যাচারী অমর যে সমগ্র
জগতকে তার পদানত করেছিল, সেও এ বিষয়ে অবশ্যই চিন্তা করত। সে তার ওপর অত্যাচার
এবং হত্যার সর্ব প্রকার কৌশল প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু প্রহ্লাদ সর্বদাই শাস্তি এবং আনন্দময়
থাকতেন। কি প্রকারে এটি সম্ভব? এই বিষয়টি অনুধাবন করতে হলে আমাদের শ্রীমদ্বাগবত
৭।১৪।৩১-৪২ শ্লোকে মহামুনি নারদ কর্তৃক প্রহ্লাদ মহারাজের গুণবলীর বর্ণনা শ্রবণ, অধ্যয়ন
করতে হবে।

নারদমুনি বলেছেন যে যদিও তিনি অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, তথাপি প্রহ্লাদ ছিলেন
ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এক মহান ভক্ত। তিনি বৈষ্ণবদের প্রতি ঈশ্বরপ্রায়ণ ছিলেন না, তিনি
ফলাকাঙ্ক্ষী বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না, সমস্ত প্রকার জড় জাগতিক আকাঙ্ক্ষা
মুক্ত ছিলেন, বিপদে বিচলিত হতেন না। তার মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের প্রতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল।
যদিও তিনি ছেট বালক ছিলেন তথাপি বালকসুলভ চাপল্যে আসক্তি ছিল না। তিনি সর্বদাই
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন, যেহেতু তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় মগ্ন
থাকতেন তাই সর্বদাই নিজেকে সুরক্ষিত ভাবতেন এবং আনন্দে থাকতেন।

“উন্নত কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার কারণে, কখনো তিনি ক্রম্পন করতেন, কখনো হাস্য করতেন,
কখনো আনন্দেচ্ছাস প্রকাশ করতেন এবং কখনো বা উচ্চস্বরে কীর্তন করতেন”। (শ্রীমদ্বাগবত
৭।১৪।৩৯)

আনন্দ উপভোগের জন্য আমাদের মতো মানুষেরা আমাদের মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে
জড়জাগতিক কর্মকাণ্ডে যথা চলচিত্র দর্শন, সিনেমার গান শ্রবণ, ফুটবল বা ক্রিকেট খেলা অথবা
অলস গ্রাম্য গাল্লে নিয়োজিত করি। কিন্তু এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের কোনটিই আমাদের হাদ্যে প্রকৃত
আনন্দের সংগ্রহ করতে পারে না। এটি শুধুমাত্র সময়ের অপচয় যা মনুষ্যজন্ম লাভের সুবিধাকে
বিফলে পর্যবেক্ষিত করে। আমরা যেহেতু জড়জগতে ভৌতিক আনন্দ লাভের প্রয়াস করি তাই
আমরা পারমার্থিক ক্রিয়াকলাপ কথা, ভগবানের দিব্য নাম জপ, কৃষ্ণকথা শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণের
শ্রীবিগ্রহ আর্চন ইত্যাদিতে কোন আনন্দ পাই না। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদের শিক্ষা প্রদান
করেছেন যে প্রকৃত সুখ হলো নিরস্তর ভগবত মুখী সেবাতে নিমগ্ন থাকা এবং জড় জাগতিক
আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা।

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে সর্বদা নিমগ্ন থেকে প্রহ্লাদ তার জীবনকে শুন্দি করেছিলেন এবং
সমস্ত প্রকার দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। তাই যখন তার ভৌতিক পিতা হিরণ্যকশিপু
তার ওপর অত্যাচার শুরু করেছিলেন তখন তিনি দৈহিক বা মানসিক কোন ভাবেই বিরুত ছিলেন
না।

কারণ তিনি পূর্ণরূপে তার পারমার্থিক পিতা শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয়ে ছিলেন। ঠিক একটি শিশু
যেমন জানে যে সকল প্রকার বিপদে তার পিতা তাকে সর্বদাই রক্ষা করবেন। অনুরূপ ভাবে প্রহ্লাদ
জানতেন যে তার পারমার্থিক পিতা পরমেশ্বর ভগবান সর্বতোভাবে তার সঙ্গে আছেন। সমগ্র
জগতবাসী জানেন যে প্রবল পরাক্রমী অসুর হিরণ্যকশিপু বহুবিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রহ্লাদের কোন
ক্ষতিসাধন করতে পারে নি। পরিশেষে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু শ্রীনৃসিংহ রূপে অবতীর্ণ হয়ে প্রহ্লাদকে
আনন্দ দান এবং হিরণ্যকশিপুকে নিধন করেন।

প্রহ্লাদের মহিমা কীর্তনে নারদমুনি বলেন, “হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, যে সভায় সাধু এবং
ভগবন্তদের সম্মনে আলোচনা হয়, সেখানে অসুরদের শক্র দেবতারাও মহান ভগবন্তদের প্রহ্লাদ
মহারাজের দৃষ্টিস্পৃষ্ঠ উল্লেখ করেন, আপনাদের মতো মহৎ ব্যক্তিদের তো কথাই নেই।”

এই নৃসিংহ চতুর্দশীর পবিত্র মাসে আসুন আমরা সকলে প্রহ্লাদ মহারাজের পদাক্ষ অনুসরণ
করে আমাদের সকল জড়বাসনা পরিত্যাগ করি এবং ঐকান্তিক ভক্তের রক্ষাকর্তা ভগবান
শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপদ্মে পূর্ণশরণাগত হই।



সুর্খৰৎ বাক্য প্রয়োগের স্বাধীনতা

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভ্যাচরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

শ্রীল প্রভুপাদ : তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাকে ধন্যবাদ, মানুষ গর্দভে পরিণত হয়েছে—দেহ ও আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য অনুভব করে না। আমাদের শিশুরা যথেষ্ট পরিমাণে দুধ পাচ্ছে তো ?

শিষ্য : হ্যাঁ যতটা তারাচায় !

শ্রীল প্রভুপাদ : হ্যাঁ। শিশুদের প্রতিদিন অস্ততপক্ষে দু'কাপ দুধ পাওয়া উচিত। যদি তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পান করে, তাদের দেহ শক্তিশালী ও সবল হবে এবং একটি তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক গড়ে উঠবে যা দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে।

মানুষ কি দেখতে পায় আমাদের জীবনযাপনের এই সরল স্বাভাবিক পদ্ধা কিভাবে সমাজকে উপকৃত করে? তারা কি দেখে আমরা শিশুদের গর্ভপাতের মাধ্যমে না হত্যা করে তাদের বালতি বালতি দুধ দিয়ে বড়ো করে তুলছি। এটা একটা উন্নততর সভ্যতা নয় কি?

শুধু দেখ। স্বার্থপরতার জন্য অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়ে মানুষ শিশুহত্যা করছে — মায়েরা নিজের সন্তানকে হত্যা করছে। এটা কি সভ্যতা ?

শিষ্য : ভগবদগীতায় কৃষ্ণ বলছেন যে তমোগুণসম্পন্ন মানুষেরা অধর্মকে ধর্ম এবং ধর্মকে অধর্ম বলবে।

শ্রীল প্রভুপাদ : ধর্ম ? এই সকল আধুনিক মূর্খদের কোন ধর্ম নেই। কোন নৈতিকতাও নেই। উদাহরণস্বরূপ এখানে আমাদের এতো শিশু রয়েছে, কিন্তু আমরা কখনও বলি না, “আমরা এই শিশুদের পালন করতে পারছি না—তাদের হত্যা কর !” আমরা কখনও তা বলি না।

এতো শিশু ? ভেবো না। তাদের কৃষ্ণচেতনার অনুশীলন করাও, ভগবৎচেতনাময় নাগরিক। তাদের নিশ্চিন্তভাবে বাঁচতে দাও এবং দুধ পান করাও।

সুতরাং কোন্টি উন্নম সভ্যতা— ? মোটরগাড়ীতে ভ্রমণ করা পাট পাট পাট—এবং তোমাদের নিজের সন্তানকে

প্রতিষ্ঠাতার বাণী

হত্যা করা। সেটা কি সভ্যতা?

শিয়ঃ : এক অর্থে এখানে এমন কি অনেক শিশু আমাদের নিজেদেরও নয়। যখন পতিহীনা কোন মা আমাদের সাথে এখানে থাকতে আসেন, স্বাভাবিক ভাবেই আমরা তার শিশুকেও স্বাগত জানাই।

শ্রীল প্রভুপাদ : সেটা দয়া। আমরা শিশুদের স্বাগত জানাই এবং আধুনিক মূর্খের শিশুদের হত্যা করে। সুতরাং কেন লোকেরা আমাদের ঐতিহ্যপূর্ণ সভ্যতা এবং তাদের তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার পার্থক্য দেখতে পায় না?

শিয়ঃ : আমাদের সভ্যতা এবং আমাদের দয়ার বিরুদ্ধে তাদের কোন ভালো যুক্তি নেই। এটা ছাড়া যে, ওরা যেমন পছন্দ করে তেমন মুক্ত থাকতে চায়। বাধাইন।

সম্পূর্ণস্বাধীন।

শ্রীল প্রভুপাদ : কিন্তু তারা স্বাধীন নয় বরঞ্চ তারা বোকা। তারা স্বাধীন নয়। প্রকৃতির নিয়মে কেই বা স্বাধীন? কিন্তু তথাপি তারা ভাবে, “আমরা মুক্ত!” একটি সৰ্বৈর মূর্খতা।

যদি তুমি বাস্তবিকভাবে স্বাধীন, তাহলে অন্যরকম হতো। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী তুমি মুক্ত নও। তোমার ক্ষুদ্রতম ভুল কার্যের জন্যও তুমি দায়বদ্ধ। ক্ষুদ্রতম ভুলের জন্যও তুমি দায়বদ্ধ। সেইজন্য কোথায় তোমার স্বাধীনতা? অহঙ্কার বিমৃঢ়াজ্ঞা কর্তাহম ইতি মন্ত্রে। অহঙ্কারে মোহাচ্ছন্ন জীব জড়া-প্রকৃতির ত্রিগুণে ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে। আমি কর্তা। এই রকম অভিমান করে। অবশ্যই যেহেতু আত্মা নিজেকে স্বাধীন কর্তা বলে মনে করে কারণ সে নিজেই কৃতিত্ব নিতে চায় এবং দায়বদ্ধ থাকতে চায়, তাই সে দায়বদ্ধ হয়। যেহেতু সে ভগবানের নির্দেশে নয় নিজের দায়িত্বে কর্ম করে, তাই তাকে দায়িত্ব নিতে হয়। পুনরায়, কোথায় তোমার স্বাধীনতা? ভগবানের জড়শক্তি — যাকে আমরা ‘প্রকৃতি’ বলি—তা তোমার সম্মতি বা অসম্মতি ক্রমেই কর্ম করে। যদি তুমি স্বাধীন হও, তাহলে তোমার দেহ বৃদ্ধ হয় কেন এবং কেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়? যদি তুমি স্বাধীন হও, তাহলে মরো না।

কেউ মরতে চায় না—যদি না সে পাগল হয়। সুতরাং কিভাবে এই আধুনিক মূর্খেরা ভাবে তারা স্বাধীন যখন তাদের মরতে হয়? এর উত্তর কি?

শিয়ঃ : তারা কিছু নির্বাক কথা বলবে। “আমি জীবনের অংশরূপ মৃত্যুকে গ্রহণ করি।”

শ্রীল প্রভুপাদ : মৃত্যু জীবনের অংশ?

শিয়ঃ হ্যাঁ। এটা স্বাভাবিক।

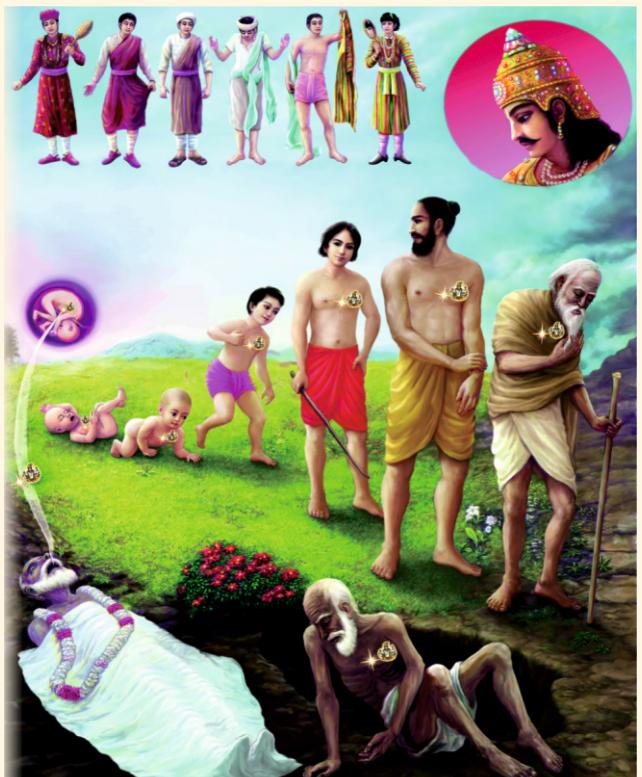
শ্রীল প্রভুপাদ : আচ্ছা তাহলে, মূর্খ, যখন মরণপন্থ বিপদ আসে কেন তখন তুমি চলে যাও? বস এবং মর। (হাসি)

প্রকৃতপক্ষে তুমি মৃত্যুকে গ্রহণ কর না, তুমি মিথ্যা প্রতারণা করছ, মূর্খের মতো কথা বলছ। তুমি মরতে চাও না। সেটাই ঘটনা। তুমি মূর্খবৎ বলছ। — “আমি মৃত্যুকে গ্রহণ করছি।” — কিন্তু তুমি এটি স্বীকার কর না। না, একেবারেই না। কিন্তু যেহেতু তোমার কোন উপায় নেই, তাই তুমি বলছ, ‘আমি মৃত্যুকে স্বীকার করি।’ প্রকৃত বিষয় হল তুমি মরতে চাও না। দুর্ভাগ্যক্রমে, তুমি দেখছ তোমার

বৃদ্ধিমান ব্যক্তি মরতে চান না। তিনি চান আধ্যাত্মিক উপলক্ষ্মীতে সম্মত হতে এবং তারপর ভগবৎধামে প্রত্যাবর্তন করে ভগবানের সাথে মিলিত হতে। তিনি চান চিরদিনের জন্য মৃত্যুকে এড়ানোর পথের সন্ধান করতে।

আর কোন উপায় নেই।” ওহ্ তাহলে আমি স্বীকার করছি। ঠিক আছে।” (হাসি)

সুতরাং তুমি এমন বলতে পার—মূর্খের মতো। (হাসি)



কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি মরতে চান না। তিনি চান আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে সমন্ব হতে এবং তারপর ভগবৎধামে প্রত্যাবর্তন করে ভগবানের সাথে মিলিত হতে। তিনি চান চিরদিনের জন্য মৃত্যুকে এড়ানোর পথের সম্মান করতে।

শিষ্য : একবার এক কলেজ ছাত্র আমাকে আস্ফালন করে বলেছিল, “মৃত্যু? আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না।” কিন্তু যখন আমি ভান করলাম তাকে আঘাত করার, স্বাভাবিকভাবেই সে ভয়ে কুঁকড়ে গেল। “দেখ?” আমি তাকে বললাম, “তুমি ভয় পাচ্ছ।”

শ্রীল প্রভুপাদ : এমনকি একটা কুকুরও মৃত্যুকে ভয় পায়। মানুষের কি কথা। যখন প্রাণীদের কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হয়, তারা ভয়ে চিংকার করে কাঁদে। এমনকি জন্মরাও মৃত্যুকে ভয় পায়। সুতরাং অবশ্যই মানুষও মৃত্যুকে ভয় পায়। প্রত্যেকে মৃত্যুকে ভয় পায়।

শিষ্য : কখনও কখনও মানুষ বলে, “আমরা জীবনকে উপভোগ করছি। কেন আপনি আমাদের সর্বদা মৃত্যু সম্বন্ধে অস্বস্তিতে ফেলেন?”

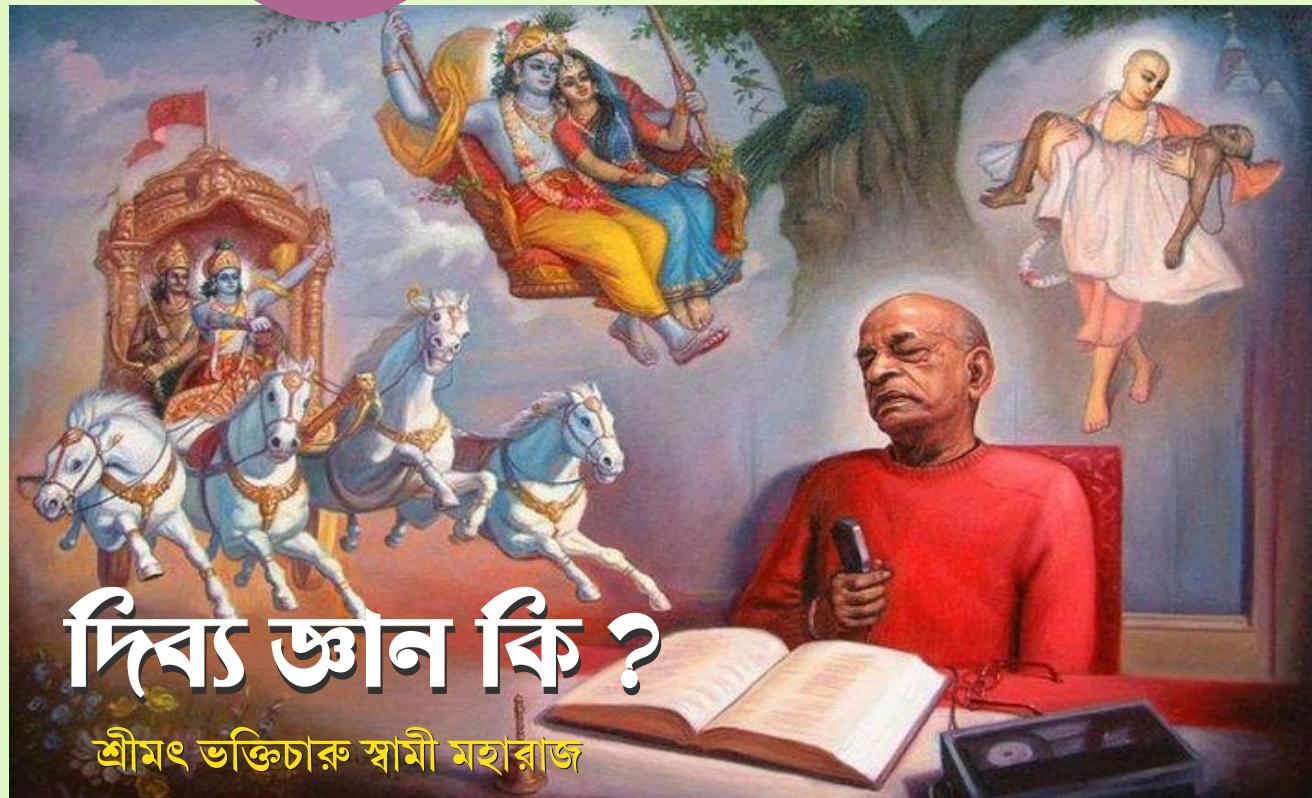
শ্রীল প্রভুপাদ : কেন? কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং আমি এটা উপলব্ধি করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমান যে যখন তোমার মৃত্যু হবে, যখন তুমি তোমার দেহ ত্যাগ করবে, তুমি হয়তো একটা নিম্নশ্রেণীর দেহপাবে এবং পরবর্তী জীবন একটা কুকুর হয়ে অতিবাহিত করবে। তোমার জন্য আমি চিন্তিত। “বন্ধু, দয়া করে কুকুর হয়ো না।”

ধর একটি শিশু কোন বাড়ীর ছাদে ঘুড়ি ওড়াচিল এবং একজন ব্যক্তি তাকে দেখেন — দৌড়ে অসাবধানতাবশতঃ ছাদের কিনারায় এসে পড়ে যেতে পারে। স্বভাবতই সেই ভদ্রলোক বলবেন, “আরে তুমি পড়ে যেতে পারো!!” এটি তার কর্তব্য।

এখন শিশুটি চিংকার করবে। আমাকে একা ছেড়ে দাও। আপনি কেন আমাকে বিরক্ত করছেন? (হাসি) কেন আমাকে বিরক্ত করছেন?

“কারণ আমি মানুষ”, ব্যক্তিটি বলবেন, “তুমি একটি মূর্খশিশু, সেইজন্য আমি তোমাকে বিরক্ত করছি।”





ଆମାଦେର ସ୍ଵରୂପେ ଆମରା କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ । ସ୍ଵତ୍ତି ସୁ-ଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମାଦେର ସ୍ଵରୂପେ ଶିତି, ସେଠି ହଛେ ଥର୍କ୍ରିତ ସ୍ଵତ୍ତି । ସତକଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଆମରା ଆମାଦେର ସ୍ଵରୂପେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହତେ ପାରିବ ତତକଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମରା ଥର୍କ୍ରିତ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରତେ ପାରିବ ନା । ଆମାଦେର ଥର୍କ୍ରିତ ପରିଚୟ ହଲ ଆମରା ସବାଇ ଭଗବାନେର ନିତ୍ୟ ଦାସ ।

“ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଏ ସତୋ ଦଦ୍ୟାତ୍ କୁର୍ବାନ୍ତି ପାପସ୍ୟ ସଂକ୍ଷୟମ୍ ।” ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାର ଫଳେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣେର ଫଳେ ପାପେର କଷ୍ଟ ହୁଯ । ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନମ୍ -ଏର ‘ଦି’ ଏବଂ ସଂକ୍ଷୟମ୍ -ଏର ‘କ୍ଷ’—ଏହି ଦୁଟି ଅକ୍ଷରେର ଯୋଗେ ହୁଯ ‘ଦୀକ୍ଷା’ ।

ଶ୍ରୀଗୁରଦେବ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଦାନ କରେନ ଏବଂ ତାର ଫଳେ ଏହି ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରହଙ୍କରୀ ଶିଯେର ପାପେର କଷ୍ଟ ହୁଯ । ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭେର ଫଳେ ଭଗବଂତତ୍ତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ହୁଦେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଯ ଆର ସେହି ଭଗବଂତତ୍ତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ହଛେ ଜୀବେର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ ।

ଜଡ୍ ଜଗନ୍ ଏବଂ ଚିଜଗନ୍—ଦୁଟି ଜଗନ୍ ରଯେଛେ । ଆମରା ଜଡ୍ ଜଗତେ ରଯେଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନାଶମାନ, କ୍ଷୟଶିଳ, ଅନିତ୍ୟ ଜଡ୍ ଜଗତେର ଉତ୍ସେର ଏକଟି ନିତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦମଯ ଜଗନ୍ ରଯେଛେ, ସେହି ଜଗନ୍ ଥିକେ ଆମରା ସକଳେ ଏସେଛି । ଆମାଦେର ସ୍ଵରୂପେ ଆମରା ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମା ଜଡ୍ ଜଗତେର ବନ୍ଧୁ ନୟ, ଆତ୍ମା ହଲ ଚେତନ ଜଗତେର ବନ୍ଧୁ । ସେହି ଚିନ୍ମୟ ଜଗନ୍ ଥିକେ ସମନ୍ତ ଆତ୍ମା ଏସେଛେ, ଆମରା ସକଳେ

ଏସେଛି । ଆମାଦେର ଥର୍କ୍ରିତ ଆଲୟ ସେହି ଚିନ୍ମୟ ଭଗବଦ୍କାମ ଯେଥାନେ ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ ବିରାଜ କରେନ ତାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଯ୍ୟଦେର ନିଯେ । ଏହି ଜଡ୍ ଜଗନ୍ ଥିକେ ସେହି ଚିନ୍ମୟ ଜଗତେ ଫିରେ ଯାବାର ଯେ ପଞ୍ଚ ସେଠି ଗୁରୁ-ଶିଯ୍ ପରମ୍ପରା ଧାରାଯ ଅନାଦି କାଳ ଥିକେ ପ୍ରବାହିତ ହଛେ । ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରନ୍ଦାକ୍ରମକେ ଏହି ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଦାନ କରେନ । ବ୍ରନ୍ଦା ଭଗବାନକେ ହୃଦୟକ୍ଷମ କରେ ବା ଭଗବାନକେ ଜେନେ ଭଗବାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯେ କଥାଗୁଲି ବଲେ ଗେଛେ ନିଯେ । ସେଠି ହଛେ “ବ୍ରନ୍ଦା-ସଂହିତା” । ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିତେ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ ବ୍ରନ୍ଦାକ୍ରମକେ ଭଗବାନ ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରେନ, ବ୍ରନ୍ଦା ସେହି ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଦାନ କରେନ ତାର ପୁତ୍ର ନାରଦ ମୁନିକେ, ନାରଦ ମୁନି ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରେନ ବ୍ୟାସଦେବକେ, ବ୍ୟାସଦେବ ତା ପ୍ରଦାନ କରେନ ମଧ୍ୟାଚାର୍ୟକେ ।

ଏହିଭାବେ ଗୁରୁ-ଶିଯ୍ ପରମ୍ପରା ଧାରାଯ ଏହି ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରବାହିତ ହଛେ । ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ହଛେ ଶ୍ରୀଗୁରଦେବେର ଚରଣଶ୍ରୀଯ କରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରା । ଗୁରୁଦେବେର କାଛ ଥିକେ ଶିଯ୍ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହନ, ସଥାମରେ ଶିଯ୍ ଗୁରୁ ହୁଁ ତାର ଶିଯ୍କେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରେନ । ଏହି ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଯେର ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଗ୍ରହଣେର ଯେ କ୍ରିୟା ସେଠିକେ ବଲା ହୁଁ ଗୁରୁ-ଶିଯ୍ ପରମ୍ପରା । ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବାହିତ ହଛେ । ଅତଏବ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହତେ ହଲେ ଆମାକେ ଏମନ କୋନ ବ୍ୟକ୍ତିର କାହେ ସେତେ ହବେ ଯାଁର କାହେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରଯେଛେ

এবং তিনিই এই জ্ঞান প্রদান করতে পারেন।

ভগবদ্গীতাতে ভগবান সেই কথা অর্জুনকে বলছেন যে, তুমি যদি এই জ্ঞান প্রাপ্ত হতে চাও তাহলে—

তদবিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়।

উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্ত্বদশৰ্নিঃ॥

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর, যে বস্তুটি জড় জগতের অতীত সেই বস্তুটি জড় ইন্দ্রিয় প্রাহ্য নয়, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। সেই বস্তুটি পাবার উপায় হচ্ছে যার কাছে তা আছে তার কাছে যেতে হবে, কিভাবে যেতে হবে? তদবিদ্ধি প্রণিপাতেন অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে নিজেকে সমর্পণ করে। যেমন ছাত্র যদি কোন শিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ করতে চায় তাহলে শিক্ষকের কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে, নিজে বিনীত হয়ে তাকে যথাযথ সম্মান প্রদান করে এই জ্ঞানটি প্রাপ্ত হতে হবে। ঐকান্তিকভাবে তাঁর কাছে প্রশ্ন করতে হবে এবং সেবার দ্বারা তাঁর সম্মতি বিধান করতে হবে। তার ফলে তিনি তখন সেই জ্ঞান দান করবেন, তিনি সোটি দান করতে পারেন কারণ তাঁর কাছে সেই বস্তুটি রয়েছে—এটিই হচ্ছে পস্থা।

আবার শ্রীমঙ্গবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই সেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—ইমং বিবস্ততে যোগং প্রোক্তবান् অহম্ অব্যয়ম্—এই জ্ঞানটি আমি সূর্যদেব বিবস্তাকে দান করেছিলাম, বিবস্তান মনবে প্রাহ—বিবস্তান তাঁর পুত্র বৈবস্তত মনুকে দান করেন, মনু ইক্ষুকবে অব্রবীৎ—এবং মনু তা ইক্ষুকুকে দান করেন। এবং পরম্পরা প্রাপ্তম্ ইমং রাজ্যয়ো বিদুঃ—এইভাবে পরম্পরার মাধ্যমে এই যোগাটি রাজ্যবিদের মাধ্যমে প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ—কালক্রমে এই যোগাটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কৃষ্ণ আবার এসে ভগবদ্গীতার মাধ্যমে এই জ্ঞানটি প্রদান করলেন। অতএব এটিই হচ্ছে দিব্য জ্ঞান লাভের উপায়। অর্থাৎ এই দীক্ষার মূল বিষয়টি হচ্ছে দিব্য জ্ঞান। অনুষ্ঠানটি আনুষঙ্গিক কিন্তু প্রকৃত বস্তুটি হচ্ছে দিব্য জ্ঞান এবং এই দিব্য জ্ঞানটি যদি লাভ না হয় তাহলে দীক্ষা অর্থহীন। সেই দিব্য জ্ঞান যাতে আমরা অর্জন করতে পারি সেই চেষ্টা আমাদের করতে হবে এবং সেইজন্য এই দীক্ষার আরোজন। আবার বলা হচ্ছে—

দীক্ষা কালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ,

সেইকালে কৃষ্ণ তারে মানে আত্মসম।

দীক্ষার সময় শিষ্য তার গুরুদেবের কাছে নিজেকে সমর্পণ

করে, তখন এই যে সমর্পিত আত্মা যে শিষ্য গুরুদেবের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে কৃষ্ণ তাকে গ্রহণ করেন। যে মাত্রায় আমরা আত্মসমর্পণ করব সেই অনুসারে কৃষ্ণ আমাদের গ্রহণ করবেন। যদি আমরা পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করি তাহলে কৃষ্ণ সেইভাবে আমাদের গ্রহণ করবেন।

গুরুদেব কৃষ্ণের প্রতিনিধি, তিনি কোন বিশেষ অলৌকিক শক্তি সম্পর্ক ব্যক্তি নন। তাঁর একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে তিনি সংগুরুর শিষ্য এবং তিনি তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে জ্ঞানটি প্রাপ্ত হয়েছেন। অর্থাৎ তিনি একজন সংগুরুর শিষ্য এবং তাঁর কাছ থেকে এই জ্ঞান নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করেছেন। গুরুদেব উদ্বার করেন না, গুরুদেবের মাধ্যমে শিষ্য উদ্বার লাভ করে। উদ্বারকর্তা হচ্ছেন কৃষ্ণ। গুরুদেব তাঁর প্রতিনিধি। যেমন কোন প্রতিনিধির কাছে গেলে এবং তিনি যদি যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করেন তাহলে সেই বস্তুটি পাওয়া যাবে। যেমন আমি যদি একটা Ambassadar গাড়ী কিনতে চাই এবং তার প্রতিনিধির কাছে আমার Order-টা পেশ করে তাকে যদি আমি চেক দিই তাহলে আমার কাছে গাড়ীটি পৌছবে কিনা? নিশ্চয়ই পৌছবে। এর জন্য Hind Motor-এর মালিকের কাছে গিয়ে আমাকে চেকটা দিতে হবে না। আমাকে Order-টা পেশ করতে হবে Hind Motor-এর Sales Representative-এর কাছে। সে যদি যথাযথ প্রতিনিধি হয় তাহলে তার মাধ্যমে আমি বস্তুটি প্রাপ্ত হব।



গাড়ীটি কিন্তু ওই প্রতিনিধির নয়, গাড়ীটি মালিকের, কিন্তু যেহেতু তিনি কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করছেন তাই তাঁর মাধ্যমে বস্তুটি আমরা পেতে পারি।

তেমনই আমরা কৃষ্ণের কৃপালাভ করতে চাই আর গুরুদেব কৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এইভাবে দেখা যাচ্ছে তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণের ভক্ত। তাই গুরুদেবের যোগ্যতা হচ্ছে তিনি হলেন কৃষ্ণভক্ত।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।

যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।।

তিনি ব্রাহ্মণ হোন, শূদ্র হোন, সন্ন্যাসী হোন, যাই হোন না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁর প্রকৃত যোগ্যতা হচ্ছে যে তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, তিনি কৃষ্ণকে জানেন। আর কৃষ্ণকে কিভাবে জানা যায় সে সম্পর্কে ভগবান অর্জুনকে গীতায় বলছেন—ভঙ্গেহসি মে সখা চেতি — আমি এই রহস্য তোমার কাছে উন্মোচন করছি, বা সবার কাছে ব্যক্ত করছি। আমি কে এটা তোমাকে আমি জানাচ্ছি। কারণ তুমি আমার

ভক্ত, তা না হলে তোমাকে

জানাতাম না। ভগবানকে কে

জানতে পারে? যিনি

ভগবানের ভক্ত তিনি

জানতে পারেন, তা

না হলে অন্যথায়

ভগবানকে জানা

সম্ভব নয়। তাই “যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।” গুরুর যোগ্যতাই হচ্ছে যে, তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণের ভক্ত। তাই এইভাবে যদি গুরুদেবের কাছে আত্মসমর্পণ হয়, কৃষ্ণের যথাযথ প্রতিনিধির কাছে যদি আত্মসমর্পণ হয় তাহলে কৃষ্ণ তাকে গ্রহণ করেন।

এতক্ষণ গুরুদেবের যোগ্যতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা হল, এখন শিষ্যের যোগ্যতা কি? শিষ্য কথাটির অর্থ প্রস্তুত। গুরুদেবের কাজ হচ্ছে শাসন করা, শিষ্যকে শাসানো, আর শিষ্যকে প্রস্তুত থাকতে হবে গুরুদেবের কাছ থেকে সেই শাস্তিটি গ্রহণ করার জন্য। গুরুদেব আমাকে শাসন করলে আমি গুরুদেবকে ত্যাগ করে চলে গেলাম—সে শিষ্য নয়। গুরুদেব যখন মিষ্টি মধুর কথা বলবেন তখন তাঁর কাছে থাকব, তাঁর কথা শুনব, আর যেই গুরুদেব আমার ভুলক্ষ্টিগুলো দেখতে শুরু করলেন, আমাকে শাসন করতে শুরু করলেন তখন আমার মন ভেঙ্গে গেল এই রকম অবস্থা যার হবে সে শিষ্য নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে শিষ্য মানে যে শাসন গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তাই দীক্ষা নেওয়ার আগে সকলকে বিচার করে নিতে হবে যে, শাসন মানতে প্রস্তুত কিনা।

এখন আমরা বিচার করি দিব্য জ্ঞানটি তাহলে কি? দিব্য জ্ঞান মানে হচ্ছে ‘কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান’। কৃষ্ণ সম্পন্নীয় জ্ঞান হচ্ছে দিব্য জ্ঞান, কৃষ্ণের গুণ সম্পন্নীয় জ্ঞান, কৃষ্ণের লীলা সম্পন্নীয় জ্ঞান, কৃষ্ণের ধার্ম সম্পন্নীয় জ্ঞান, কৃষ্ণের পার্বদ সম্পন্নীয় জ্ঞান, কৃষ্ণের ভক্ত সম্পন্নীয় জ্ঞান, কৃষ্ণের পরিকর সম্পন্নীয় জ্ঞান। এগুলিই হচ্ছে দিব্য জ্ঞান। এগুলি জড় জগতের বিষয় নয়, এগুলি চিজ্জগতের বিষয় এবং চিজ্জগতের যা কিছু বিষয় তা হচ্ছে দিব্য জ্ঞান।

এই জড় জগতের জ্ঞানটি জড়জ্ঞান বা অজ্ঞান, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান কি? তা হল ভগবদ্তত্ত্ব জ্ঞান। সেই জ্ঞানটি যখন উপলব্ধি

হয় সেটি হল বিজ্ঞান বা বিশেষ

জ্ঞান। কৃষ্ণ কে? তা আমরা

Theoretically জানলাম কিন্তু

Practically উপলব্ধি ছাড়া ততক্ষণ

পর্যন্ত সেটি কেবল জ্ঞান, কিন্তু যখন সেই দিব্য

জ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশিত হয় তখন সেটিকে বলা

হয় বিজ্ঞান। যারা দীক্ষা লাভ করতে চায় তাদের

সেই দিব্য জ্ঞান বা বিজ্ঞান প্রাপ্ত হবার

প্রয়াসী হতে হবে। অতএব আমাদের

বিচার করে দেখতে হবে এই যে দীক্ষা

এটি কেবলমাত্র একটি অনুষ্ঠান নয়।



প্রশ্ন১। কুস্তী, ট্রোপদী, অনসূয়া আদি সতী নারীদের মতো নিশ্চয় সৎপুরুষও আছে। এই সৎপুরুষ কে কে এবং তাদের গুণাবলী কিরূপ?

উত্তরঃ আপনি এখানে তিন জন সতী নারীর নাম করেছেন। কিন্তু সতী নারী অসংখ্য। তেমনই সৎপুরুষও অসংখ্য। সতীর যেমন তিনটি বৈশিষ্ট্য । ১। ভগবৎভক্ত, ২। স্বামী অনুরাগিনী ও ৩। পরিবারের স্বার প্রতি দায়িত্বশীল। অনুরূপভাবে, সৎপুরুষেরও তিনটি বৈশিষ্ট্যঃ-

১। তিনি সত্যের পূজারী অর্থাৎ শ্রীভগবানের সনিষ্ঠ ভক্ত। ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানী। ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিত্ব। শ্রবণ কীর্তন-স্মরণ প্রভৃতি ভক্তি-অঙ্গ যাজনে উন্মুখ। ভক্তসেবা পরায়ণ।

২। তিনি পত্নী অনুরাগী। জগতের অন্য নারীর প্রতি কথনও কাম-নজর দেন না। সুসন্তান লাভের উদ্দেশ্যেই মাত্র পত্নী সঙ্গ বাসনা করেন।

৩। তিনি পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল। পরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতা, গবাদি পশু, প্রতিবেশীদের প্রতিও তিনি স্নেহযত্ন পরায়ণ।

যারা প্রতিনিয়ত কামাচারী, যারা ভক্তি অনুশীলনহীন, যারা কলহপরায়ণ, খল, যারা পরিবারের সদস্যদের প্রতি বিকৃত আচরণ করে তারা সৎব্যক্তি নয়।

প্রশ্ন২। তিলকনা পরলে কি ভক্ত হওয়া যায় না?

উত্তরঃ ভক্ত অবশ্যই শ্রীভগবানের নির্দেশ অবজ্ঞা করবে না। ভগবানের উক্তি হলো—

মৎপ্রিয়ার্থ শুভার্থস্বা রক্ষার্থে চতুরানন।

মন্ত্রক্ষেত্রে ধারয়েন্নিত্যমূর্ধ্বপুঞ্জং ভয়াপহ্ম।

“হে ব্রহ্মা! আমার ভক্ত আমার প্রীতির জন্যে, তার নিজের মঙ্গলের জন্যে এবং নিজের রক্ষার নিমিত্ত ভয় নাশকারী উর্ধ্বপুঞ্জ তিলক প্রতিদিন ধারণ করবে।” (পদ্মপুরাণ)

শ্রীনারদ মুনি বললেন—

যচ্ছ্রীরং মনুষ্যানামূর্ধ্বপুঞ্জং বিনা কৃতম্।

দ্রষ্টব্যং নৈব তত্ত্ববৎ শাশান সদৃশং ভবেৎ।।

“উর্ধ্বপুঞ্জ তিলকহীন মানুষের শরীরের শাশান সদৃশ। সেই ব্যক্তি দর্শনের যোগ্য নয়।” (পদ্মপুরাণ)

প্রশ্ন৩। ‘আসার কালে দেবতা, যাওয়ার কালে পিশাচ’ এই কথার অর্থ কি?

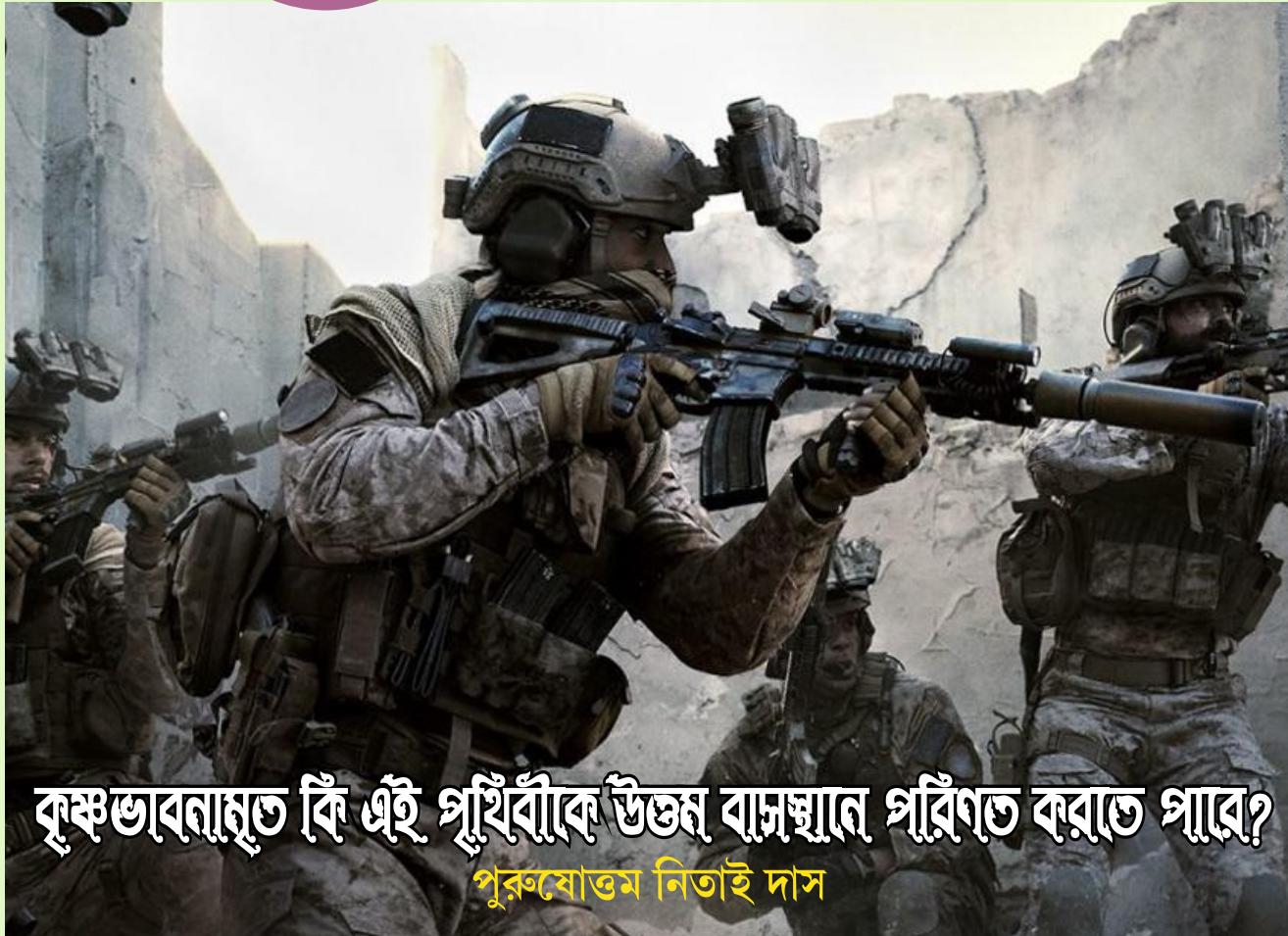
—নীলমনি দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমান

উত্তরঃ সন্তান যখন জন্মালো তখন তার প্রথম খাদ্য হচ্ছে মায়ের দুধ। কয়েক মাস পর তার অন্তর্প্রাশন বা মুখেভাত অনুষ্ঠান হলো। পায়সাঙ্গ ভোজন করল। পায়সাঙ্গ হচ্ছে দেবতার খাদ্য। কিন্তু সে যখন তার পরিবারের অন্যদেরকে মাছ-মাংস খেতে দেখল, সেও সেগুলি খেতে শিখল। বিয়ে অনুষ্ঠানেও মাছ-মাংস, যদিও পায়সাঙ্গাদি বহু রকমের ব্যঞ্জন আছে, তবুও তার পাশাপাশি অমেধ্য বিষয় মেশানো। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে মাছ-মাংস। অর্থাৎ যাওয়ার সময় পিশাচের খাদ্য। পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ।

প্রশ্ন৪। ‘গঙ্গা শুকালেই পার হবো’—এই কথার ব্যাখ্যা কি?

উত্তরঃ কামনা বাসনা শুকিয়ে গেলেই হরিনাম করবো। এখন যেহেতু ধোঁয়া খাওয়ার অভিক্ষম আছে, কৈনি মুখে রাখার মন আছে। মাছ-মাংসের ভোজ ভক্ষণের লোভও শুকায়নি, এর তার বাড়িতে আড়া দেওয়ার ইচ্ছা আছে, গাল গল্ল থেকে শুরু করে তর্ক-বিতর্ক ও নানা সংবাদ জঞ্জাল সংগ্রহের আগ্রহ আছে, সারারাত চিভিতে ভূত-পেত্তীর নাচ দেখার মোহ শুকায়নি, চৌমাথার মোড়ে মোড়ে তাস-জুয়া খেলার নেশাও করেনি, লোকদের পিছনে লাগার ঝোঁকটাও জোর মাত্রায় রয়েছে। সুতরাং এই সময়ে আঘীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীরা যদি আমাকে দেখে যে, আমি তুলসী মালা গলায় পরেছি, হাতে জপমালা ধরেছি, কপালে তিলক পরেছি, তাহলে লজ্জায় একেবারে আমার মাথা খসে পড়বে। তাছাড়াও আমার এখন বয়স মাত্র





কৃষ্ণভাবনামৃত কি এই পৃথিবীকে উত্তম বাসস্থানে পরিণত করতে পারে?

পুরুণোত্তম নিতাই দাস

আজ এই প্রশ্নটি অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃত কি এই পৃথিবীকে উত্তম বাসস্থানে পরিণত করতে পারে, বিশেষত যখন রাশিয়া এবং ইউক্রেন নামক দুইটি দেশ পরম্পরার যুদ্ধে লিপ্ত।

ইউরোপের যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থানরত আমি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ওপর মতবাদ প্রকাশের যোগ্য ব্যক্তি নই। আমি একজন ভূ-রাজনৈতিকও নই যে এই গণমানবতা সংকট সৃষ্টিকারী যুদ্ধটি কেন হচ্ছে তার বিশ্লেষণ করব। যদি আমরা শুধুমাত্র পাশ্চাত্য এবং পাশ্চাত্য সংবাদ মাধ্যমকে বিশ্বাস করি তাহলে রাশিয়া অর্থাৎ পুতিনই হলো অপরাধী, কিন্তু সেখানে অনেক মানুষ আছেন যারা বিশ্বাস করেন যে ইউক্রেনে পাশ্চাত্য দেশীয় নীতির কারণে রাশিয়াকে তার নিকটতম প্রতিবেশী ইউক্রেন আক্রমণে উত্তেজিত করেছিল। সমস্ত অনেকে ব্যতিরেকে এটিই সত্য যে সাধারণ মানুষ, দুই দেশের সৈন্যগণ মৃত্যুবরণ করছে, শিশুরা অনাথ হচ্ছে, মানুষেরা তাদের স্বগত পরিত্যাগ করে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রত্যেকেই দুর্দশাপ্রস্ত, কোন বিবেকবান মানুষই রাশিয়ার এই আগ্রাসনকে সমর্থন করতে পারেন না।

বর্তমান যুদ্ধটি সংঘটিত হচ্ছে ইউরোপে কিন্তু কিছুদিন পূর্বে যুদ্ধ ছিল আফগানিস্থানে। বহু যুদ্ধেই তা বৃহদাকার বাস্তুদ্রাকার যাই হোক না কেন সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তা ঘটে চলেছে। তার মধ্যে কোনটি বিশদরূপে জনসমক্ষে আসে, আর কোনটি আসেনা।

বর্তমান কলিযুগের লক্ষণ সমূহ বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত আছেঃ

যখন আমি এই বিপজ্জনক বিশ্বের অবস্থা দেখি তখন আমার বৈদিক শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বর্ধিত হয়। শুধুমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধ ১২ পাড়ুন যার নামকরণই হলো অধঃপতিত যুগ। এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলিযুগের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে আমরা বর্তমানে যে অবস্থার মধ্যে বসবাস করছি তার পুঞ্জান্পুঞ্জ বর্ণনা দেওয়া আছে। আজকের পৃথিবীর যা অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি তা সেখানে ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায়টি বলে যে, “এই যুগে সহিষ্ণুতা, দয়া এবং সততা নামক গুণগুলি নিম্নগামী হবে। আইন এবং বিচার শুধুমাত্র ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে প্রয়োগ করা হবে। শাসকগণ গোভী এবং হিংসাপ্রায়ণ হবে।”

এটি সেই যা বর্তমান দুনিয়াতে ঘটে চলেছে এবং আমাদের মনে রাখতে হবে যে বর্তমান সময়টি শুধুমাত্র কলিযুগের প্রারম্ভ। পরিস্থিতি ভবিষ্যতে জগন্য থেকে জগন্যতম হবে। কলিযুগকে “কপটতা এবং ভগ্নামির যুগ” বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ এই যুগে দৈহিক এবং মানসিক উভয় ভাবেই পীড়িত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, ‘আধুনিক যুগে প্রায় সব কয়টি দেশই অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করছে কিন্তু ব্যবসায়িক লেনদেনের ফলে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে গেছে। চরমে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধের সৃষ্টি হয়, তার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে ধ্বংসলীলা শুরু হয় এবং মানুষ প্রচণ্ড দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে।’ (শ্রীমদ্বাগবত ৫।১৩।১৩ তাৎপর্য)

কোন সমাধান সূত্র আছে কি?

সুতরাং এই সমস্যার কি কোন সমাধান আছে, না নিরবে আমাদের দুর্দশা ভোগ করতে হবে?

বৈদিক শাস্ত্র সমূহ শুধুমাত্র জীবকুলকে দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তার কথা বলেন, এছাড়াও এই সমস্যার যথাযথ সমাধানের সূত্রও প্রদান করে।

পবিত্র বেদ বলে যে বর্তমান যুগটি অতিশয় অধঃপতিত। এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই। কিন্তু এতে একটি ভাল, শুধু ভাল নয় মহান সুযোগ লুকায়িত আছে। তা হলো এই যুগে ভগবত্কৃপা লাভ করা সহজ এবং কিরণে তা লাভ করা সন্তুষ্ট ভগবান নিজে তা বিভিন্ন শাস্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হয়ে আমাদেরকে কৃষ্ণভক্তি লাভের পথা শিক্ষাদান করেছেন। তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী এই যুগে আমরা যদি শুধুমাত্র

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম জপ করি তাহলেই আমরা কৃষ্ণকে প্রাপ্ত করতে পারব। কতটাই সহজ! তিনি আমাদেরকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে বলেছেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম হরে হরে।

এই মহামন্ত্র আমাদের হৃদয়কে নির্মল করে পাপবাসনা মুক্ত করে আমাদের কৃষ্ণ-অভিমুখী করে। ভগবান শ্রীচৈতন্য শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ন্যায় মহান আচার্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম প্রচার করতে। কয়েক দশক পূর্বে ভগবান শ্রীচৈতন্যের এক মহান ভক্ত শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সমগ্র জগতকে কৃষ্ণভাবনাময় করে তোলার জন্য সর্বোত্তম প্রয়াস করেছিলেন।

পবিত্র বেদ বলে যে বর্তমান যুগটি অতিশয় অধঃপতিত। এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই। কিন্তু এতে একটি ভাল, শুধু ভাল নয় মহান সুযোগ লুকায়িত আছে। তা হলো এই যুগে ভগবত্কৃপা লাভ করা সহজ এবং কিরণে তা লাভ করা সন্তুষ্ট ভগবান নিজে তা বিভিন্ন শাস্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

কৃষ্ণভাবনামৃত কি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে?

এখন প্রশ্ন হলো এই যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে কৃষ্ণভাবনামৃত কতখানি প্রাসঙ্গিক? শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম জপ কি সমগ্র জগতের বিতর্ক বন্ধ করতে পারে? এবং কৃষ্ণভাবনামৃত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে সক্ষম হবে?

আমি জানি না। এটা প্রমাণ করার জন্য আমার কাছে তথ্য নেই। এবং এছাড়াও, আমি একজন শুন্দি ভক্ত না যে এটি

প্রমাণ করতে পারবো। তথাপি আমার কিছু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি বলতে পারি যে কৃষ্ণভাবনামৃত আমাদেরকে বিবেকবান করে, একটি উন্নত সমাজ গঠন করে। কিন্তু শর্ত হলো তা আমাদেরকে নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস করতে হবে।

দুটি উদাহরণ : আমি যখন ইসকনে যোগদান করেছিলাম তখন একটি উন্নতি আমি বারংবার শুনেছিলাম তা হলো, “প্রভুপাদ এমন একটি গৃহ নির্মাণ করেছেন যেখানে সমগ্র পৃথিবীবাসী সুখে বসবাস করতে পারে।” প্রকৃত পক্ষে দেখেছিলাম বিভিন্ন

দেশের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একত্রে শান্তি ও আনন্দের সঙ্গে বসবাস করছে। হিন্দুগণ, খ্রীষ্টানগণ, মুসলমানগণ, শিখগণ, কালো ও সাদা চামড়ার মানুষজন একত্রে বসবাস করে। কোন জাতি ও ধর্মের সাপেক্ষে বৈষম্য নেই। প্রসাদ পাছে সব কিছুই একত্রে। ভক্তরা তাদের সকল ভৌতিক পরিচয় ত্যাগ করে একসঙ্গে ভগবানের দিব্য নাম জপ করছেন, মহিমা কীর্তন করছেন এবং এইভাবেই তারা তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট।

অপর আর এক উদাহরণ হলো যখন আমি যুক্তরাজ্যে রথযাত্রা উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলাম রথযাত্রা উৎসবের শুভ সুচনা করতে ভক্তরা একজন যুক্তরাজ্য সরকারের গণ্যমান্য আধিকারিককে আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি মনে করতে পারি তিনি ছিলেন মহানাগরিক। যখন উৎসবের উদ্বোধন হচ্ছিল তিনি খুব সুন্দর একটি কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এই উৎসবে যোগদান করে আমি খুব উৎসাহিতায় অভিভূত। কারণ এই উৎসবে কালো এবং সাদা চামড়ার মানুষ একত্রে মিলেমিশে আনন্দ উৎসবের পালন করছে। এই উৎসবে চামড়ার রঙের পরিপ্রেক্ষিতে কোন বৈষম্য নেই।

রাশিয়া ইউক্রেন ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সময় বহু সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যা হলো বহু মানুষ ইউক্রেন থেকে পালাতে চাইছে কারণ তাদের চামড়ার রঙের কারণে তারা বৈষম্যের শিকার। সীমান্তে কালো এবং সাদা চামড়ার মানুষদের পৃথক লাইন এবং কালো চামড়ার লোকেদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে।

কিন্তু আপনি বিশ্বের যে কোন প্রান্তে কোন ইসকন মন্দির যদি পরিদর্শন করেন সেখানে আপনি কোন বৈষম্য দেখতে পাবেন না। কালো, বাদামী, সাদা - সকলে একই সঙ্গে একটি পঞ্জিতে দণ্ডায়মান, একে অপরের হাত ধরে কুকুরের সন্তোষ বিধানের জন্য নৃত্য করছে।

সুতরাং আমি পূর্বে যা বলেছি যে আমি জানি না যে কৃষ্ণভাবনামৃত যুদ্ধ বন্ধ করতে পারবে কিনা, পৃথিবীর রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে কিনা, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আমাদেরকে সত্য মানবিকতাপূর্ণ মানুষে পরিণত করবে। কৃষ্ণভজ্ঞি আমাদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করে এবং তখন আমরা অন্যদেরকে আমাদের ভ্রাতা ও ভগীর রূপে দেখতে পাই। এবং আমরা কখনো তাদেরকে হত্যা করতে চাই না এমনকি আমরা আমাদের ভ্রাতা ও ভগীর ক্ষতি সাধনও করতে চাই না কারণ তাদেরকে আমরা ভালবাসি।

শ্রীল প্রভুপাদ যখন তরুণ বয়সে তার পরমারাধ্য গুরুদের শ্রীল ভজ্ঞিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সঙ্গে ১৯২২ সালে প্রথম সাক্ষাৎকারে যান তখন তাঁর গুরুদের তাঁকে বলেন কৃষ্ণভাবনামৃত জরুরী, এটি অন্য কোন কিছুর জন্য থেমে থাকতে পারে না। কারণ যদি মানুষ কৃষ্ণভাবনাময় না হয় তাহলে তারা ভয়ানক হবে এবং সেই সমস্ত ভয়ানক মানুষ মানবতার শক্তিতে পরিণত হবে।

কিন্তু মানুষ যদি নিষ্ঠার সঙ্গে কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন করে তাহলে তারা সকলে হিতাকাঙ্ক্ষীতে পরিণত হবে এবং তখন এই পৃথিবী একটি উত্তম বসবাসের স্থানে পরিণত হবে।





ছানা – পটল

উপকরণ : টাটকা পটল ১২টি। দুধ ১লিটার। ছানা কাটা পাউডার। লবণ ১ টেবিল চামচ। হলুদ আধা চা-চামচ। তাজা ধনে গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ। কাঁচা লংকা টাটকা ৩টি কুচি করা। সরিয়ার তেল ৪ টেবিল-চামচ। পাঁচ ফোড়ন আধা চা-চামচ।

প্রস্তুত পদ্ধতি : ১। পটল ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে গোল গোল টুকরো করে আমান্য করণ। ২। অল্প জল দিয়ে প্রেসার কুকারে পটলগুলো সেদ্ধ করে নিন। ৩। দুধ ফুটিয়ে পাউডার দিয়ে ছানা কাটুন। ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ছানা থেকে জল আলাদা করুন। ছানাসহ ছাঁকনিটা একটা বাটির ওপর রাখলে জল বারতে থাকবে। ৪। পটল সেদ্ধ হলে নামিয়ে

বুড়িতে রেখে জল ঝরান। ৫। কড়াইতে তেল গরম করুন। তেল গরম হলে পাঁচফোড়ন দিন। তারপর হলুদ, ধনে গুঁড়ো, লবণ দিয়ে মিনিট দুয়েক হালকা আঁচে ভাজুন। কাঁচা লংকা কুচি দিয়ে খুস্তিতে নাড়িয়ে দিন। ৬। এবার জল ভালো করে ঝরিয়ে সেদ্ধ পটলগুলি কড়াইতে দিন। ভালো করে মিনিট দশ-পনেরো কয়ে নিন। ৭। জল ঝরানো শুকনো ছানা মিশিয়ে দিন। কিছুক্ষণ নাড়ুন। ৮। এক কাপ জল মিশিয়ে দুই মিনিট ফুটিয়ে মাখো মাখো অবস্থায় নামিয়ে নিন। ৯। অন্ন বা রংটি সহযোগে শ্রীশ্রীরাধামাধবকে ভোগ নিবেদন করুন।

– দামোদর রতি দেবী দাসী

আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর

৯ এর পাতার পর

একচল্লিশ বছর। এখন আমার ভোগের সাগরে গা ভাসানোর কথা।

তারপর, বুড়ো কালে যখন হজম শক্তি কমে যাবে, রক্তের তেজ শুকিয়ে যাবে, হাত-পা অসাড় হয়ে যাবে, কিছু চিবোতে পারবো না, সব কিছু বাপসা দেখবো, মাঝে মাঝে গাঁও গাঁও আওয়াজ করবো, তখনই ঘরে সাদর সজ্জিত পালকে অতি সুন্দর করে বসে হরিভজন চালিয়ে যাবো। তখন ছেলে-বৌমা কিংবা নাতি-বৌ আমাকে দেখে আমার চরণে একশোপঁচিশ বার প্রণাম ঠুকাবে। অস্তিম লঞ্চ এলেই কেউ না কেউ ‘বল হরি, হরি বোল’ করবে। ততক্ষণে আমি (আজ্ঞা) বহু পথ অতিক্রান্ত হয়ে যমের বাড়ীতে হাজিরা দিয়ে দেবো।

তারপর যমদণ্ড ভোগ হাজার হাজার বছরের জন্য নির্ধারিত হবে। তখন আশা, ভরসা, মন, বুদ্ধি—সব শুকিয়েই যাবে। কিন্তু যাতনা শরীরটা নষ্ট হবে না, শাস্তি চলতেই থাকবে। এভাবে নরক যাতনা ভোগের জীবন কাল পার হয়ে যাবো। এই হলো ‘গঙ্গা শুকালেই পার হবো’ কথাটির তাৎপর্য।

—প্রশ্নোত্তরে : সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী



শ্রীমদ্ভগবতীতার প্রাথমিক আলোচনায় অর্জুনের চতুর্দশতম প্রশ্ন কমলাপতি দাস

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট অর্জুন শ্রীমদ্ভগবতীতায় ১৬টি প্রশ্ন করেছিলেন। তার মধ্যে চতুর্দশতম প্রশ্নটি করেছিলেন চতুর্দশ অধ্যায়ের একুশ নং শ্লোকে।

কৈর্লিস্পেন্স্নীন গুণানেতান্তীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন গুণান্তিবর্ততে ॥

(গীতা ১৪।১১)

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু যিনি এই তিন গুণের অতীত, তিনি কি কি লক্ষণ দ্বারা জ্ঞাত হন? তাঁর আচরণ কি রকম? আর তিনি কেমন ভাবে এই তিন গুণ অতিক্রম করেন? এখন স্বাভাবিক ভাবে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগবে কেন অর্জুন এইভাবে গুণাতীত ব্যক্তি সম্বন্ধে তিনটি প্রশ্ন করলেন? আমরা দেখতে পাই চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনটি গুণ সম্বন্ধে সুন্দর ভাবে আলোচনা করার পর মৃত্যুর পর তিনগণ সম্পূর্ণ

ব্যক্তিদের (গীতা ১৪।১৮) কি কি গতি লাভ হয় সেই সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। তারপর তিনি আলোচনা করেছেন—

প্রকৃতির তিনটি গুণই সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে আর পরমেশ্বর ভগবান এই ত্রিগুণকে নিয়ন্ত্রণ করেন। যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হয়েছেন—তিনিই এই ত্রিগুণ থেকে মুক্ত। তাই তাঁর কাছ হতে জ্ঞান লাভ করার মাধ্যমেই ত্রিগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তিনি এই জড় দেহের মধ্যে থাকলেও তিনি দিব্য জীবনের চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। (গীতা ১৪।১৯)

তখন অর্জুনের মনে প্রশ্ন জাগল এই ধরনের দিব্য পুরুষের লক্ষণ কি? কেমন ভাবে জ্ঞানতে পারা যাবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই জড়া- প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন—তিনি কেমনভাবে জীবন-যাপন করেন এবং তাঁর কার্যকলাপ কি রকম? সেগুলি কি নিয়ন্ত্রিত না অনিয়ন্ত্রিত? তৃতীয় প্রশ্ন—কি উপায়ে দিব্যপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়? সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দিব্যস্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার সরাসরি উপায় সম্বন্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত না অবগত হওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই লক্ষণগুলি প্রদর্শন করার কোন

সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং, অর্জুনের এই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভগবান সেই প্রশ্নগুলি সুন্দরভাবে উত্তর দিয়েছেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ২২নং-২৫নং শ্লোকে দিয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ২২নং থেকে ২৫নং শ্লোকগুলির মাধ্যমে প্রথমেই বলেছেন যে, গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি কারও প্রতি দ্বেষযুক্ত নন এবং তিনি কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। আসলে জীব যখন জড় দেহে অবস্থান করে, তখন বুঝতে হবে—সে এই জড় প্রকৃতির তিনটি গুণের কোনও একটির দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সে যখন এই জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন সে জড়প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকেও মুক্ত হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সে দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারছে, ততক্ষণ তাকে গুণের প্রভাবের প্রতি উদাসীন থাকতে হবে। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় তাকে নিযুক্ত হতে

হবে, যাতে জড় দেহের পরিপ্রেক্ষিতে তার পরিচয়ের কথা সে আপনা থেকেই ভুলে যেতে পারে। কিন্তু কেউ যখন তার জড়দেহের চেতনায় যুক্ত থাকে, তখন সে কেবল তার ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য কর্ম করে। কিন্তু সেই কর্ম যখন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয় তখন ইন্দ্রিয়তর্পণ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। দেহের মধ্যে অবস্থিত প্রকৃতির গুণগুলি কর্ম করে যাবে, কিন্তু চিন্মায় সন্তানপে আস্তা এই সমস্ত কার্যকলাপ থেকে পৃথক। তিনি পৃথক হন কিভাবে? তিনি জড় দেহটিকে ভোগ করারও আকাঙ্ক্ষা করেন না অথবা দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। এইভাবে গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ভগবদ্গুরুর ফলে স্বাভাবিক- ভাবেই মুক্ত হন। জড়াপ্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁকে কোন রকম প্রচেষ্টা করতে হয় না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—গুণাতীত ব্যক্তির আচরণ কি রকম? জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ দেহ সম্বন্ধীয় তথাকথিত সম্মান ও অসম্মানের দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এই ধরনের মিথ্যা সম্মান ও অসম্মানের দ্বারা প্রভাবিত হন না—তিনি নির্বিকারে কৃষ্ণসেবা করে যান। তিনি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। তাঁকে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলিও

প্রভাবিত করতে পারে না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য সব কিছু করেন। কিন্তু তাঁর নিজের জন্য তিনি কোন কিছুই করেন না। এই ধরনের আচরণই গুণাতীত ব্যক্তির আচরণ।

তৃতীয় প্রশ্ন—গুণাতীত স্তরে কিভাবে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ১৪। ২৬ নং শ্লোকে উভর প্রদান করলেন।

মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।

স গুণান্সমতীত্যেতান্ব্ৰস্মাভূয়ায় কল্পতে ॥

“যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে আমার সেবা করেন, তিনি প্রকৃতির সমস্ত গুণকে অতিক্রম করে ব্ৰহ্মাভূত স্তরে উঠান্ত হন।” এই শ্লোকে “অব্যভিচারেণ” শব্দের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে কৃষ্ণসেবা ভিন্ন অন্য কোন কিছুর প্রতি আসক্তি না থাকা। ভক্তরা যেহেতু ঐকান্তিকভাবে শুধুমাত্র কৃষ্ণসেবায় রত থাকেন, তাই গুণের সেবা করার কোনো সুযোগ থাকে না। এটিই গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার সরাসরি পদ্ধা। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেছেন যে, ‘সদগুরুর চরণে আস্তসমর্পণ করার মাধ্যমে, গুরুদেবের দাস মনে করে তাঁর আদেশ-নির্দেশ নিষ্ঠা সহকারে ঐকান্তিক সহকারে পালন করার মাধ্যমেই সহজে গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়।





ভগবৎসল ভগবান শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব স্বরাট মুকুন্দ দাস

তব করকমলবরে নখমন্তুতশৃঙ্গং
দলিত হিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম।
কেশব ধৃত-নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে ॥

হে কেশব যখন আপনি নৃসিংহরূপ ধারণ করেছিলেন তখন
আপনার করকমলের নখবলী অতীব আশ্চর্যাৰহ হয়েছিল।
আপনি ঐ নখ দ্বারা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর তনুভৃঙ্গটিকে
বিদলিত করেছিলেন। হে নৃসিংহ রূপী জগদীশ! হে হরে!
আপনার জয় হোক। (শ্রীশ্রীদশাবতার স্তোত্র ৪)

ভগবান নৃসিংহদেব হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দশ
অবতার এবং তিনি তাঁর নখের দ্বারা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে
নিধন করেছিলেন।

চতুর্দশং নারসিংহং বিভূদৈত্যেন্দ্রমূর্জিতম্।
দদার করজেরাবেরকাং কটকৃদ্যথা ॥

(ভাগবত ১/৩/১৮)

ভগবান নৃসিংহদেবের আবির্ভাব, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু
নিধন এবং ভক্তরাজ প্রহ্লাদকে সর্বতোরূপে রক্ষা লীলার
প্রেক্ষাপটটি কিরণ তা আলোচনা করা প্রয়োজন। অন্যথায়
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হওয়া এবং মহান

ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করার লীলামৃত আস্থাদন অপূর্ণ থেকে
যাবে।

একদা মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান
করেছিলেন তখন সেখানে উপস্থিত শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি
বিদ্যেষবশতঃ কটু বাক্য সহযোগে নিন্দামন্দ করতে থাকেন।
উপস্থিত অন্য সকলে এই আচরণে ক্রোধান্বিত হলেও শ্রীকৃষ্ণ
সকলকে শান্ত হতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে তিনি
শিশুপালের মাতাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি শিশুপালের
শত অপরাধ ক্ষমা করবেন তারপর তাকে দণ্ডনান করবেন। তাই
সেই সত্য রক্ষা করে ভগবান শততম অপরাধের পর তাঁর
সুদর্শন চক্র দ্বারা শিশুপালের মস্তক ছেদন করেন। শিশুপাল
মৃত্যুলাভ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহে বিলীন হয়ে যায়। এই
অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করে যুধিষ্ঠির মহারাজ নারদ মুনিকে প্রশ্ন করেন
যে ভগবানের প্রতি বিদ্যৈ হওয়া সত্ত্বেও অসুর শিশুপাল
কিভাবে এই দুর্লভ সায়জ্য মুক্তি লাভ করল? উত্তরে দেবৰ্ষি
নারদ বর্ণনা করতে শুরু করলেন। একদা ব্রহ্মার চার পুত্র সনক,
সনন্দন, সনাতন এবং সনৎকুমার ত্রিভূবন পরিঅমণ করতে
করতে কোন এক সময় বৈকুঞ্চি উপনীত হয়েছিলেন।



আপাতদৃষ্টিতে তারা দেখতে ছেট বালকের ন্যায় এবং বসনহীন হওয়ার কারণে বৈকুঞ্ছের দুই দ্বারপাল জয় ও বিজয় তাদেরকেও সাধারণ বালক বোধহেতু বৈকুঞ্ছে তাদের প্রবেশে বাধা দিলেন। এইরপে চতুর্ষুমারগণ জয় বিজয় দ্বারা প্রতিহত হওয়ার কারণে ক্রোধবশতঃ তাদের অভিসম্পাত করলেন। বললেন, “তোমরা রঞ্জো ও তমোগুণের দ্বারা পরিচালিত, তাই তোমরা নিষ্ঠাগত ভগবানের সমীক্ষার থাকার অযোগ্য। তোমরা জড়জগতে অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণ কর!” এই রূপে চতুর্ষুমারগণ দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে তারা যখন বৈকুঞ্ছ থেকে পতিত হচ্ছিলেন তখন চতুর্ষুমারগণ তাদের এই বলে আশ্বস্তও করেছিলেন যে তিনি জন্মের পর তারা আবার বৈকুঞ্ছে ফিরে আসবে। অতঃপর ভগবানের এই দুই পার্য্যদ জয় ও বিজয় প্রথম জন্মে দিতি ও কশ্যপের পুত্ররপে হিরণ্যকশিপু (জ্যেষ্ঠ) এবং হিরণ্যক্ষ (কনিষ্ঠ) নামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, দ্বিতীয় জন্মে রাবণ ও কৃষ্ণকর্ণ এবং তৃতীয় জন্মে শিশুপাল ও দন্তবক্র।

ভগবান যখন বরাহ অবতারে বরাহ রূপ ধারণ করে গর্ভোদক সমুদ্র থেকে পৃথিবীকে উদ্বার করেছিলেন তখন হিরণ্যক্ষ তাঁকে বাধা দেন এবং ভীষণ যুদ্ধে বরাহদেব হিরণ্যক্ষকে সংহার করেন।

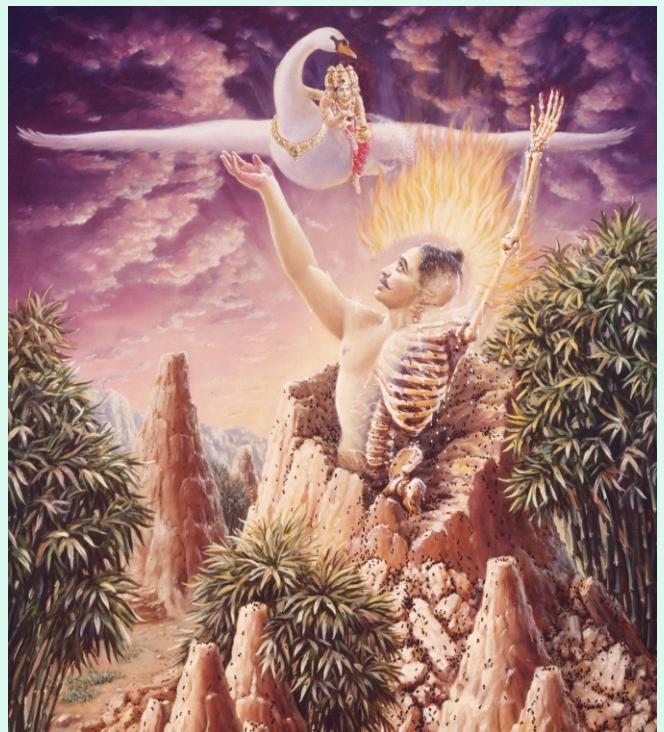
এইভাবে ভগবান বিষ্ণু যখন বরাহ অবতার রূপে হিরণ্যক্ষকে সংহার করেন তখন তার আতা হিরণ্যকশিপু প্রবল ক্রোধান্বিত হয়েছিল। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে রক্তবর্ণ করাল দৃষ্টিতে চতুর্দিক অবলোকন করতে থাকে। উন্মত্ততার কারণে সমস্ত দানব—শন্মুর, শতবাহু, নমুচি ইত্যাদি সকলকে নির্দেশ দিয়েছিল যে তার শক্ত দেবতাদের পক্ষ নিয়ে বিষ্ণু তার আতাকে হত্যা করেছে। তাই পৃথিবীতে তপস্যা, যজ্ঞ, বেদ অধ্যয়ন, ব্রত, দানকার্য ইত্যাদিতে রত মানুষদের হত্যা কর আর সে নিজে

বিষ্ণুর মস্তক ছেদন করে তাঁর রক্তের দ্বারা তার আতা হিরণ্যক্ষের তপর্ণ করবে। আদেশ প্রাপ্ত অসুরেরা জীব হিংসাতে লিপ্ত হলো। এই ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কারণে বৈদিক কার্যকলাপ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল এবং দেবতারা তাতে অত্যন্ত বিচলিত হলেন।

আতার মৃত্যুতে শোকাহত এবং ক্রোধান্বিত হয়ে হিরণ্যকশিপু তার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করে আতুপ্পুত্রদের এবং স্বজন বান্ধবদের সাস্ত্রান্বিত প্রদান পূর্বক জড়জাগতিক লাভ, প্রতিশোধ এবং অমরত্ব প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মন্দার পর্বতের উপত্যকায় অত্যন্ত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেছিল।

হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যার ফলে তার শরীর থেকে নির্গত তাপ থেকে সমস্ত প্রহলোক অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়েছিল। তার সেই কঠোর তপস্যার কারণে দেবতাগণ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ব্ৰহ্মার শরণাগত হন এবং হিরণ্যকশিপুর এই উপদ্রব নিবারণের জন্য কাতৰ অনুরোধ করেন। তখন ব্ৰহ্মা, দেবতাগণ, ভূগু, দক্ষ আদি ঋষিগণ সহযোগে হিরণ্যকশিপু উপস্থিত হলেন এবং তাকে বললেন, “তুমি তপস্যাতে সিদ্ধিলাভ করেছ। এখন তোমার বাসনা অনুসারে বর প্রার্থনা কর!”

হিরণ্যকশিপু ব্ৰহ্মাকে দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। অতঃপর ব্ৰহ্মাদেবকে প্রণতি নিবেদন করে



কৌশলপূর্বক কপট হিরণ্যকশিপু প্রায় আমরত্বের বর প্রার্থনা করল, “আপনার সৃষ্টি কোন প্রাণী থেকে আমার মৃত্যু না হয়, গৃহের অভ্যন্তরে বা বাইরে, দিনের বেলা অথবা রাতে, ভূমিতে অথবা আকাশে যেন আমার মৃত্যু না হয়, আপনার সৃষ্টি জীব ছাড়াও অন্য কারো দ্বারা, কোন অস্ত্রের দ্বারা, কোন মানুষ দ্বারা অথবা পশুর দ্বারা যেন আমার মৃত্যু না হয়। প্রাণী অপ্রাণী কারো থেকে আমার মৃত্যু না হয়।” (ভাগবতম ৭/৩/৩৫-৩৮)

এই ভাবে হিরণ্যকশিপু তার অভীষ্ঠ বর লাভ করার পর দশদিক, তিনিলোক এবং দেবতা ও অসুরদের বশীভূত করেছিল। সমস্ত দেবতারা তার দাসত্ব প্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং এই প্রকারে সে চরম নির্যাতন শুরু করেছিল। এমতাবস্থায় বিভিন্ন লোকের

লোকপালগণ, অধিবাসীগণ প্রবল অত্যাচারে অত্যন্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর স্তব-স্তুতি করলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাতে সন্তুষ্ট হয়ে সকলকে আশ্বস্ত করে বললেন, “হিরণ্যকশিপুর সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি অবগত আছি এবং অচিরেই আমি তার সেই সমস্ত দুর্ঘর্মের সমাপ্তি সাধন করব। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর।” (ভাগবতম ৭/৪/২৬)

হিরণ্যকশিপু যখন মন্দার পর্বতে তপস্যা করছিল, তখন ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাগণ তার প্রাসাদ আক্রমণ করে এবং হিরণ্যকশিপুর গর্ভবতী স্ত্রী কয়াধুকে তারা বন্দি করেন। কিন্তু দেবর্ষি নারদ কয়াধুকে ‘পাপহীনা’ বলে বর্ণনা করে দেবতাদের

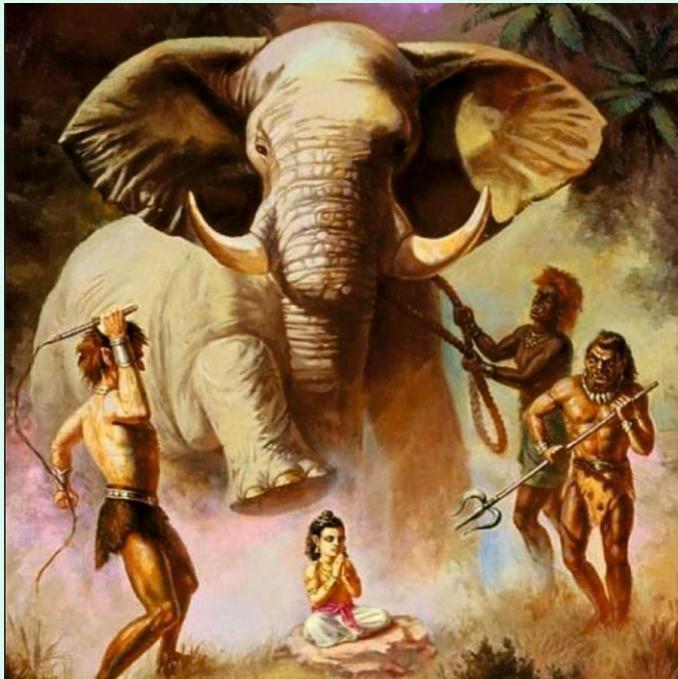
নিকট হতে তাকে মুক্ত করেন। নারদমুনি কয়াধুকে নিজ আশ্রমে রেখে তাকে ও তার গর্ভস্থ সন্তানকে ভগবন্তক্রিয় পাঠ দান করেন। সময় অতিক্রান্ত হলে কয়াধু প্রহ্লাদ নামে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। গর্ভাবস্থা থেকেই ভগবন্তক্রিয় মহিমা শ্রবণের কারণে প্রহ্লাদ শিশুকাল থেকেই নারদমুনির তত্ত্বাবধানে পরম বিষ্ণুভক্ত হয়ে ওঠেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার ভক্তি ছিল অবিচল এবং অনন্য। প্রেমে বিস্মল চিত্তে কখনো তিনি

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে নিধন করার পর ভগবান নৃসিংহদেব অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট ছিলেন। ব্রহ্মা, শিব, এমনকি মাতা লক্ষ্মীদেবীও ভগবানের সম্মুখে যেতে সাহস পাননি। তখন ব্রহ্মদেব প্রহ্লাদ মহারাজকে ভগবানের ক্রোধ নিবারণের জন্য তাঁর নিকট প্রেরণ করেন।

ক্রন্দন করতেন, কখনো হাসতেন, কখনো আনন্দ প্রকাশ করতেন, আবার কখনো উচ্চেস্থে কীর্তন করতেন। উপযুক্ত সময় আসল হলে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে অন্যান্য অসুর বালকদের সঙ্গে পাঠশালাতে অধ্যয়নের নিমিত্ত প্রেরণ করল। পাঠগ্রহণ সমাপনাস্তে হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে তার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ সম্বন্ধে জানতে চাইল তখন প্রহ্লাদ তার উত্তরে নববিধা ভক্তি সহযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় জীবন অর্পণ করাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলে অভিহিত করলেন। প্রহ্লাদের মুখে এই কথা শ্রবণ মাত্র হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো এবং প্রহ্লাদকে ভূতলে নিক্ষেপ করল। সমস্ত অসুরদের আদেশ দিল তোমরা বধের যোগ্য এই বুদ্ধিভূষিত বালককে এই মুহূর্তে হত্যা কর।

আদেশ প্রাপ্তির পর ভয়ঙ্কর দৃশ্য অসুরেরা প্রহ্লাদের ওপর চরম অত্যাচার যথা ত্রিশূল দ্বারা আঘাত, অস্ত্রের দ্বারা আঘাত, হস্তীর পদতলে স্থাপন, ভয়ানক সর্পদের মধ্যে নিক্ষেপ, বিষ প্রয়োগ, পর্বত শৃঙ্গ থেকে নিক্ষেপ, অগ্নিতে নিক্ষেপ এবং আরও বহুবিধ পদ্ধতিতে হত্যার প্রচেষ্টা করল। কিন্তু প্রহ্লাদ ভগবান বিষ্ণুর ধ্যানে সর্বদা নিমিত্ত থাকার কারণে সেই সকল প্রকার অশুভ ও নির্মম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। এতে হিরণ্যকশিপু উদ্বিগ্ন হয়ে প্রবল ক্রোধে দিশাহারা হয়ে পড়ল।

প্রহ্লাদ মহারাজের দিব্য উপদেশের কারণে সমস্ত দৈত্যবালকেরা যখন কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল, পরিস্থিতি তখন হিরণ্যকশিপুর সহ্যসীমা অতিক্রম করাতে সে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সিদ্ধান্ত করল যে সে নিজ হস্তে প্রহ্লাদকে হত্যা করবে। তাই সে প্রহ্লাদকে তিরক্ষার করতে শুরু করল। প্রহ্লাদ মহারাজ তাতেও নির্বিকার। তখনও তিনি বলছেন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সকলের নিয়ন্তা, হে পিতা আপনি ও তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় প্রার্থন করুন। আপনার মঙ্গল হবে। এতে



দৈত্যরাজ ক্রেত্বে অন্ধ হয়ে বলে, “তোর ভগবান যদি সর্বত্র থাকে তাহলে এই স্তম্ভের মধ্যেও আছে?” প্রহৃদ নিষ্ঠা সহকারে শান্তভাবে বললেন অবশ্যই আছেন। দৈত্যরাজ অহঙ্কারে সেই স্তম্ভে আঘাত করতেই সেই স্তম্ভ থেকে ভয়ঙ্কর ধ্বনি সহযোগে নৃসিংহরূপ প্রকাশিত হলেন।

সত্যং বিধাতুং নিজভূত্যভাষিতং
ব্যাপ্তিং চ ভূতেষাখিলেষু চাঞ্চনঃ ।
অদৃশ্যতাত্যদ্রুতরূপমুদ্ধনঃ ।।
স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষম্ ॥

“ভগবান তাঁর মহান ভক্ত প্রহৃদের বাক্যের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে এক অস্তুত মূর্তিতে (না সিংহ না মানুষ) সভাগৃহে আবির্ভূত হলেন।” (ভাগবত ৭/৮/১৭)

ভগবানের সেই রূপ ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। দৈত্যরাজ ভগবানকে আক্রমণ করলে ভগবান ব্রহ্মাদেবের বরটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে সভাগৃহের স্তম্ভ বিদীর্ণ করে অসুররাজ হিরণ্যকশিপুকে সংহার করলেন এবং তাঁর মহান ভক্ত প্রহৃদকে রক্ষা করলেন।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে নিধন করার পর ভগবান

নৃসিংহদেব অত্যন্ত ক্রেত্বাবিষ্ট ছিলেন। ব্রহ্মা, শিব, এমনকি মাতা লক্ষ্মীদেবীও ভগবানের সম্মুখে যেতে সাহস পাননি। তখন ব্রহ্মাদেব প্রহৃদ মহারাজকে ভগবানের ক্রোধ নিবারণের জন্য তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। প্রহৃদ ভগবান নৃসিংহদেবের বাঁসল্যের বিষয়ে সর্বতোভাবে নিশ্চিত ছিলেন তাই নির্বিকার ও ভয়হীন চিত্তে শ্রীভগবানের নিকট গমন করে তাঁর প্রতি প্রণতি নির্বেদন করেন। ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের নিমিত্ত তাঁর স্ব ও স্তুতি শুরু করেন। এইভাবে মহান ভক্ত প্রহৃদের স্ব স্তুতি শ্রবণ করে ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর ক্রেত্ব সম্মরণ করেছিলেন। তার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে প্রহৃদকে পূর্ণরূপে কৃপা প্রদান করেছিলেন। (ভাগবত ৭/৯/৮-৫৫)

তাই ভক্তগণ যদি ঐকাস্তিকতার সঙ্গে ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের আরাধনা, সেবা, প্রহৃদ মহারাজের শিক্ষা প্রহণ, মহিমা কীর্তন ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকেন তাহলে সকলেই ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের কৃপালাভ করতে সক্ষম হবেন।



ব্রহ্মসংহিতা

ভাস্মান् যথাশ্মসকলেযু নিজেযু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদ্ব।
ব্ৰহ্মা য এষ জগদগুবিধানকর্তা
গোবিন্দমাদিপুরূষং তমহং ভজামি।।৪৯।।

ভাস্মান—জ্যোতির্ময় সূর্য; যথা—যেমন; অশ্ম—সকলেযু—বিভিন্ন প্রকার মণিতে; নিজেযু—তাঁর নিজের; তেজঃ—তেজ; স্বীয়ম—তাঁর নিজের; কিয়ৎ—কিছু পরিমাণে; প্রকটয়তি—প্রকাশ করে; অপি—ও; তদ্বৎ—সেই রূপে; অত্র—এখানে; ব্ৰহ্মা—ব্ৰহ্মা; যঃ—যিনি; এষঃ—প্রভু; জগৎ-অগু-বিধান-কর্তা—ব্ৰহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা; গোবিন্দম—আদি-পুরূষ—আদিপুরূষ গোবিন্দকে; তম—তাঁকে; অহম—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

সূর্য যেমন বিভিন্ন মণিতে তার তেজ কিছু পরিমাণে প্রকট করে, তেমনই যে আদি পুরূষ গোবিন্দ কোন পুণ্যবান জীবের মধ্যে তাঁর শক্তি সঞ্চার করে ব্ৰহ্মারূপে ব্ৰহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য সাধন করেন, তাঁকে আমি ভজনা করি।।

ভাস্মান্ যথাশ্মসকলেযু নিজেযু তেজঃ—সূর্য যেমন বিভিন্ন মণিতে নিজ তেজ কিছু পরিমাণে প্রকাশ করে। সূর্যের নিজস্ব তেজ, তাপ, প্রতাপ, প্রভাব রয়েছে। বিভিন্ন মণি রয়েছে। মণিগুলি হচ্ছে একরকম আধার বা আশ্রয় যার উপর সূর্যের আলো পড়ে সূর্যের মতোই কিছুটা প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়।

স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদ্ব।—সেই রকম এক্ষেত্রে ভগবান নিজের তেজের কিঞ্চিং পরিমাণে প্রকাশ করেন। মহাবিশ্বের হৃত্কর্তা পালয়িতা পরমেশ্বর ভগবান যদি কোন ব্যক্তিকে কৃপাদৃষ্টি দিয়ে থাকেন, তবে সেই ব্যক্তি অসম্ভব বা অসাধ্য কর্ম ও সন্তুষ্ট বা সফল করে তোলেন।

ব্ৰহ্মা য এষ জগদগুবিধানকর্তা—ব্ৰহ্মা যাঁর থেকে প্রাপ্তশক্তি হয়ে ব্ৰহ্মাণ্ডের বিধান করেন। ভগবান কোনও পুণ্যবান জীবের মধ্যে তাঁর শক্তি সঞ্চার করে ব্ৰহ্মারূপে ব্ৰহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কার্য-সাধন করেন।

গোবিন্দমাদিপুরূষং তমহং ভজামি—ব্ৰহ্মা যাঁর থেকে শক্তি পেয়ে ব্ৰহ্মাণ্ডের বিধান করেন সেই আদিপুরূষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ব্ৰহ্মা দুই প্রকার—১। কোনও কল্পে উপযুক্ত জীবে ভগবৎ-শক্তির আবেশ হলে সেই জীবই ‘ব্ৰহ্মা’ হয়ে কার্য বিধান করেন। ২। কোনও কল্পে সেরকম উপযুক্ত জীবে

থাকলে শ্রীকৃষ্ণ নিজ শক্তির বিভাগক্রমে রজোগুণাবতার ব্ৰহ্মাকে সৃষ্টি কৰেন।

তদ্বতঃ, ব্ৰহ্মা সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্ৰহ্মা সাক্ষাৎ ঈশ্বর নন। ব্ৰহ্মা অপেক্ষা শিবের ঈশ্বরতা অধিক পরিমাণে আছে। ব্ৰহ্মাতে জীবের পঞ্চশঙ্খণ অধিকভাৱে আছে এবং তা ছাড়াও আৱৰ্তন পাঁচটি গুণ আংশিক রূপে আছে। শিবের মধ্যে পঞ্চানন গুণ অধিকমাত্ৰায় আছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্মারীকে বললেন—

ভক্তিমূল্য কৃতপুণ্যে কোন জীবোত্তম।

রজোগুণে বিভাবিত কৰি তাঁৰ মন।।।

গৰ্ভোদকশায়ী দ্বাৰা শক্তি সঞ্চারি।

ব্যষ্টি সৃষ্টি কৰে কৃষ্ণ ব্ৰহ্মা-রূপ ধৰি।।।

পূৰ্বৰূপ ভক্তিমূল্য পুণ্যকৰ্মের প্রভাবে পুণ্যবান কোনও উন্নত জীবকে গৰ্ভোদকশায়ী বিষ্ণু রজোগুণের দ্বাৰা বিভাবিত কৰে তার মধ্যে নিজ শক্তি সঞ্চার কৰেন এবং ব্ৰহ্মারূপে তার দ্বাৰা জগতে সৃষ্টিকার্য সাধন কৰেন। (চৈতন্যচৰিতামৃত মধ্য ২০।।।৩০২-৩০৩)

প্রতিটি ব্ৰহ্মাণ্ডের ভেতরে গৰ্ভোদক সমুদ্রে শায়িত (গৰ্ভোদকশায়ী) বিষ্ণুৰ নাভি পদ্ম থেকে সৃষ্টিৰ প্রথম জীব ব্ৰহ্মার জন্ম হয়।

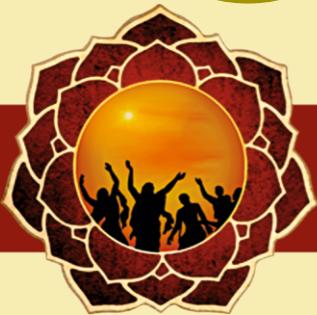
কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।

আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ‘ব্ৰহ্মা’ হয়।। (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।।।৩০৫)

কোন কল্পে ভগবান যদি ব্ৰহ্মা হওয়াৰ মতো উপযুক্ত জীব না পান, তাহলে তিনি নিজ অংশের দ্বাৰা ব্ৰহ্মারূপে প্রকাশিত হন।

বৃহৎ ভাগবতামৃতে বলা হয়েছে, যে জীব মনুষ্যরূপে একশত জন্ম ধৰে বৰ্ণশৰ্মণ ধৰ্ম পালন কৰেছেন, সেই ব্যক্তি ব্ৰহ্মা হওয়াৰ উপযুক্ত পাত্ৰ হন। একশত জন্ম—প্রতি জন্মে চারি বৰ্ণ যেমন ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য ও শুদ্ৰ—যেৱৰূপে আসবেন তাঁৰ নিজ নিজ কৰ্তব্য বা দায়িত্ব পালন কৰবেন। আৱ, প্রতি জন্মে চারি আশ্রম যেমন ব্ৰহ্মচাৰী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ধাসী—যে রূপে আসবেন তাঁৰ নিজ নিজ কৰ্তব্য বা দায়িত্ব পালন কৰবেন। একশত জন্ম এভাবে কৰ্তব্য পালন কৰতে পাৱলে ব্ৰহ্মার পদে আসীন হতে পাৱা যাবে। এই চতুর্দশ ভূবনেৰ সৰ্বোচ্চ লোক সত্যলোকে তিনি নিবাস কৰতে পাৱবেন।

—সনাতনগোপাল দাস ব্ৰহ্মচাৰী



বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনাধূতের কার্যাবলী

মায়াপুরের প্রভুপাদ ঘাট অনুমোদন পেল



ইসকন মায়াপুর অতি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছে যে ভারত সরকার তার জাতীয় স্বচ্ছ গঙ্গা প্রকল্পের (NMCG) আওতায় ১৫.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মায়াপুরের শ্রীল প্রভুপাদ স্নান ঘাটটিকে নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছেন।

এই প্রকল্পটি ভারত সরকারের এক বিখ্যাত নির্মাণ সংস্থা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস ইণ্ডিয়া লিমিটেড নির্মাণ করবে। এই ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থাটি পৃথিবীর দশটির বেশী দেশে ৬০০-র বেশী প্রকল্প রূপায়িত করেছে যার অর্থমূল্য ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশী।

অনেক ভক্ত তাদের দীর্ঘ এক বছরেরও বেশী সময়ের অধ্যাবসায় সহযোগে দিল্লী এবং মায়াপুরে জটিল নিয়ম, বিধি নিয়ে ইত্যাদি দূর করে এই পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন।

মায়াপুর সহ-নির্দেশক হাদয় চৈতন্য প্রভু কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং তার তত্ত্বাবধানেই এই প্রকল্পটি নির্মাণ হবে।

ইসকন মায়াপুর যুথিষ্ঠির গোবিন্দ দাস প্রভুকেও ধন্যবাদ জানায়, কারণ তার নিরলস প্রয়াস এবং নিয়মিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সরকারী আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার যার ফলাফল হলো এই প্রকল্পের অনুমোদন এবং নির্মাণের ছাড়পত্র পাওয়া।

ইসকন মায়াপুর দেবকীনন্দন প্রভুকেও ধন্যবাদ জানায়, কারণ তিনি সজ্জন জিন্দালজির মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করেছেন।

সহ-নির্দেশকগণ যথা শ্রীমদ্ভুজ জয়পতাকা মহারাজ এবং

সুবেক্ষণ প্রভু এই ঘাট নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত জমি ক্রয় করার অনুমোদন দিয়েছেন।

সহ-নির্দেশক ব্রজবিলাস দাস বলেন, “আমরা মাধবগৌরাঙ্গ প্রভুর মায়াপুর দলকে ধন্যবাদ জানাই যারা এই প্রকল্প রূপায়নে সহায়তা করেছেন, নন্দন প্রভু যিনি মাষ্টার প্ল্যান বিভাগের সদস্য যিনি সমস্ত অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেন, জগদার্তিহা প্রভু অতিরিক্ত জমি সংগ্রহে সহায়তা করেন এবং অক্ষয় রামচন্দ্র প্রভু আইনি উপদেশগুলিতে সহায়তা করেন।”

প্রভুপাদ ঘাটের বৈশিষ্ট্য সমূহঃ ৭৫ মিটার (২০০ ফুট) স্নান এলাকা, হলু চেয়ারের জন্য সিঁড়ি, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য প্রসাধন ও পোশাক পরিবর্তন কক্ষ, সবুজ পার্ক বেঞ্চ ও রাত্রিঘর, উচ্চস্তুত বাতি, গঙ্গার মধ্যে সুরক্ষা রেলিং এবং শিকল, অফিস ও সুরক্ষাকর্মী কক্ষ। এই ঘাটটি হলো মায়াপুর মাষ্টার প্রজেক্টের প্রথম প্রকল্প যা মাষ্টার প্ল্যান বিভাগের প্রধান হাদয় চৈতন্য প্রভু দেখাশোনা করছেন।

শ্রীমায়াপুরে গৌরপূর্ণিমা মহোৎসবে লোকে লোকারণ্য



ইসকন মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা মহোৎসবের সূচনা হয়ে থাকে পূর্ণিমা তিথির একমাস আগের থেকেই। ২৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ১লা মার্চ শ্রীমদ্বাগবত কথা শ্রবণ উৎসব চলতে থাকে মায়াপুর হরেকৃষ্ণ নামহাট্ট ভবনে। ১লা মার্চ উৎসব পতাকা উন্মোলন পদ্মাভবন পার্কে। ২রা মার্চ শ্রীল প্রভুপাদ ভজন কুটিরে

শ্রীশ্রীরাধামাধব ও শ্রীমায়াপুরচন্দ্রকে রথে করে সুন্দর শোভাযাত্রা সহকারে মন্দির থেকে নিয়ে আসা হলো। রঙেলী আঙ্গনা অক্ষিত পথ, মৃদঙ্গবাদকের সারি, রাধামাধবের উপর পুষ্পবর্ষণ। বিশেষ পুষ্পদলে নির্মিত পোশাকে সুসজ্জিত শ্রীবিঘ্ন। পঞ্চাশ বছর আগে শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই জন্য একে রাধামাধব ও মায়াপুরচন্দ্রের কনক জয়স্তী উৎসব বলা হয়। ভজন কুটীরে সমবেত ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, শ্রীপাদ ভবানন্দ প্রভু, শ্রীপাদ জননিবাস প্রভু শ্রীশ্রীরাধামাধবের স্মৃতিচারণ করে প্রবচন প্রদান করেন। রাগা, ভোগ নিবেদন, মহা আরতি, ধূনো দান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে। রাত সাড়ে আটটায় সবার জন্য মহাপ্রসাদ বিতরণ চলে। ৩০ মার্চ একটি রথে শ্রীমায়াপুরচন্দ্র ও শ্রীশ্রীরাধামাধব এবং অন্য এক রথে শ্রীশ্রীগৌরনিতাই ইসকন মন্দিরের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট পরিভ্রমণ করেন। কয়েক সহস্র প্রদীপ মণ্ডপ দীপে শোভিত ভবন, হরিনাম মুখের পরিবেশ। ৪ঠা মার্চ পাশ্চাত্য দেশ তারিনে সেন্টিনিয়াল উৎসবে কীর্তন শোভাযাত্রা সহকারে নতুন বৃহৎ মন্দির TOVP তে শ্রীশ্রীরাধামাধব, শ্রীমায়াপুরচন্দ্র, শ্রীনিয়ন্ত্রন পাদুকা, শ্রীনরসিংহ সাটারী আনয়ন করা হয়। সেখানে মহাঅভিষেক অনুষ্ঠান হয় এবং শ্রীপাদ অন্বরীশ প্রভু, শ্রীপাদ ব্রজবিলাস প্রভু, শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, শ্রীপাদ জননিবাস প্রভু প্রমুখ বিশেষ বক্তব্য রাখেন। ৫ মার্চ সর্বজনপ্রিয় প্রধান পূজারী শ্রীপাদ জননিবাস প্রভুর পূজারী বৃত্তির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসবে শাস্তি হোম্যজ্ঞ, জননিবাস প্রভুর অভিষেক, মহাপ্রসাদ বিতরণ চলে।

৬ মার্চ থেকে ১০ মার্চ পাঁচদিন শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা চলে। এই পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করেছিলেন পাঁচ হাজার ভক্ত। সেই সময়ে শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির অভ্যন্তরে চলে কীর্তন মেলা। ১১ মার্চ থেকে ১৭ মার্চ গীতাভবন পার্কে বিশাল মণ্ডপে চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পর্ক। ১৩ মার্চ শ্রীশ্রীরাধামাধবের নোকাবিহার ও ঝুলন্ত্যাত্মক প্রভুপাদ পুষ্প সমাধিস্থানে। ১৪ মার্চ গঙ্গাঘাটে পতিতপাবনী গৌরগঙ্গা মন্দিরে গঙ্গাঘাটে গঙ্গাপূজা আরতি ভজন প্রবচন অনুষ্ঠান। ১৫ মার্চ শাস্তিপুর উৎসবে প্রায় চল্লিশ হাজার লোককে প্রসাদ বিতরণ। ১৭ মার্চ রথযাত্রা এবং গৌরপূর্ণিমার অধিবাস।

১৮ মার্চ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি মহোৎসব। ১৯ মার্চ জগন্নাথ মিশ্রের আনন্দ-উৎসব। গৌরপূর্ণিমাতে দুই লক্ষ ভক্ত অতিথি দর্শনার্থী সমবেত হন। ঐ দিনই অনন্দান কমপ্লেক্সে পঞ্চাশ হাজার অতিথি বিনামূল্যে মহাপ্রসাদ প্রহণ করেন। বিশাল মাঠে চারটি অভিষেক মঞ্চ ছিল। মূল মন্দিরের

বিগ্রহগণ একটি মঞ্চে এবং পাশাপাশি অন্য তিনটি মঞ্চে অর্চাবিগ্রহ গৌরনিতাইকে পৃথকভাবে বিশেষ অতিথিবৃন্দ, মাতাজীবৃন্দ এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দ আপন হাতে শঙ্খ ধরে অভিষেক করেন। পঞ্চগব্য, ডাবের জল, বিভিন্ন ফলের রস, ফুলের পাপড়ি দিয়ে মহাঅভিষেক চলে। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী—উজ্জ্বল বিশ্বাস ও স্বপন দেবনাথ, নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি রিস্কা কুণ্ড, তারামু সুলতানা, নবদ্বীপ বন্দর পঞ্চাশয়েত সমিতির সভাপতি তাপস ঘোষ প্রমুখ। সারা মাঠ, পথঘাট ছিল অসংখ্য ভক্ত দর্শনার্থীতে ভরা। ইসকন মন্দির চতুরে দর্শনার্থীদের বিনামূল্যে পানীয় জল, বাতাসা, ছাঁচ, শিশুদের জন্য গরম দুধ প্রতিদিন দেওয়ার জন্য তিনটি হেলপ্রডেক্স চালু ছিল।

সমগ্র উৎসব পরিচালনা নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, শ্রীমৎ ভক্তিপুরঘোষম স্বামী, শ্রীপাদ সুবেক্ষণ প্রভু, শ্রীপাদ ব্রজবিলাস প্রভু প্রমুখ। গৌরপূর্ণিমায় উপক্ষে পড়া মানুষের ভীড় মায়াপুর মহাতীর্থে সবাইকে বিস্মিত করে তুলল।

ইসকন মেগা ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল



ইসকন ধানবাদ তাদের মেগা ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল ধানবাদে খুব জাঁকজমক পূর্ণ রূপে পালন করল। কোভিডের সমস্ত নিয়মকানুন মেনে এক বর্ণাত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যোগ দান করেন। শ্রীদেবকীনন্দন প্রভু যুব সমাজে ভগবদ্গীতার শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে এক মহামূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। ন্যূন্য কীর্তন ও প্রসাদ সহযোগে উৎসবটি প্রাণময় হয়ে ওঠে। প্রায় ১০৫০ জন যুবক এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে। উৎসব শেষে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্য আনন্দিত চিন্তে প্রেক্ষাগৃহ থেকে গৃহ অভিমুখে গমন করেন।

অস্ট্রেলিয়াতে ভয়ঙ্কর বন্যা এবং ত্রাণ কার্য



মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া—এই সপ্তাহে উত্তর পূর্ব অস্ট্রেলিয়াতে ভয়ঙ্কর বন্যার কবলে কমপক্ষে একডজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তীব্র দুর্বোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে অধিবাসীদের স্থানান্তরণ করতে হয় এবং স্কুল বন্ধ করা হয়েছে। সেখানে হাজার হাজার গৃহ বন্যার জলে ভেসে গেছে।

অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল থেকে হাজার হাজার মানুষকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, কারণ বিগত কয়েক দশকে এই রকম ভয়ঙ্কর বন্যা দেখা যায় নি।

ঐ এলাকাতে বসবাসকারী প্রায় তিনশত মানুষ যার মধ্যে হরেকুক্ষণ ভক্তরাও আছে তাদের স্থানান্তর করা হয়। বহু ভক্ত এই বন্যাতে তাদের ঘরের আসবাবপত্র, গাড়ী, এবং আরও অনেক কিছু হারিয়েছে। শহরে ও ঘরে তাদের ব্যবসা সর্বস্বাস্ত হয়েছে।

বিসবেন, কুইচল্যাণ্ড, সিডনী শহরতলী, নিউসাউথ ওয়েলস সেখানে ইসকনের সর্ব বৃহৎ খামার বাড়ী রয়েছে সেটি এবং মুরউইলান্ড রিট্রিট সেন্টার বন্যার জলে পূর্ণ রূপে নিমজ্জিত যা বিগত পাঁচশত বছরেও হয় নি।

বর্তমানে বহু রাস্তায় ধস নেমেছে, বেশ কয়েক মাস যাবৎ রাস্তা মেরামত করা সম্ভব নয়। সোমবার থেকে মুরউইলান্ড দ্বিপে পরিণত হয়েছে। আসা যাওয়ার সমস্ত রাস্তা বন্যায় ফ্লাবিত এবং বন্ধ। কোন বিতরণকারী ট্রাক আসতে পারছে না।

স্থানীয় ভক্তরা দ্রুত গরম গরম প্রসাদ বন্যাদুর্গত ক্ষতিগ্রস্ত বিসবেনে বিশেষ সেবা দান করছেন।

সামরিক হেলিকপ্টার বন্যাকবলিত এলাকা থেকে মানুষদের উদ্ধার করছে এবং গবাদি পশুদের বন্যায় ডুবে থাকা একটি সেতু থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

ইলাস্ট্রেশনস এ্যাণ্ড ইলুমিনেশন : শ্রীল প্রভুপাদের শৈল্পিক মহিমা কীর্তন



ইসকন ভক্ত তথা একজন ব্রহ্মচারী সাধু এবং শিল্পী হরিদাস ঠাকুর দাস কৃষ্ণপ্রাণীমূর্তি এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের জীবনের ওপর একটি চমকপ্রদ চিত্রকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। প্রদর্শনীটি ভারতবর্ষের এক খ্যাতনামা জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারীতে ১৫-২২ মে মার্চ ২০২২ প্রদর্শিত হয়।

হরিদাস ঠাকুর দাস রচিত বই ‘ইলাস্ট্রেশন এণ্ড ইলুমিনেশনস’ দিয়ে উদ্বোধনের পর এই শিল্প প্রদর্শনীর সূচনা হয়। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি বহু গণ্যমান্য অতিথি ব্যক্তিবর্গ, প্রবীণ ভক্তগণ যার মধ্যে নরসিংহ চৈতন্যদাস, দেবকীনন্দন দাস, ব্রজহরি দাস, যশ বিরলা, সিশা জানুয়াল, সৌরভ পাণ্ডে এবং আরও অনেকের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। এই উদ্বোধনীর অনুষ্ঠানটি রাধানাথ স্বামী মহারাজের লাইভ ভিডিওটির সহযোগে শুরু হয়।

“ইলাস্ট্রেশনস এ্যাণ্ড ইলুমিনেশনস” হলো শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিময় জীবনের এক শৈল্পিক মহিমা কীর্তন যা শ্রীল প্রভুপাদের ১২৫তম জন্ম বার্ষিকী স্মারণিকা। হরিদাস ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদের জ্ঞানগর্ত অমূল্য শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে এক চমকপ্রদ শিল্পকলা রচনা করেছেন যা একজনকে আধ্যাত্মিকতা এবং ভক্তিযোগের রাস্তায় চলতে সহায়তা করবে।

হরিদাস ঠাকুর দাস বলেন, “এই বইটি হলো আমার সমস্ত শিল্প সৃষ্টির সমঘং। আমি এক ক্ষুদ্র প্রয়াস করেছি এটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে শ্রীল প্রভুপাদ তার কর্ম এবং অবদান দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে এক সচেতনতা প্রদান করেছেন যা তার ১২৫তম জন্ম বার্ষিকীতে আমি রঙ ও তুলির দ্বারা নিবেদন করেছি।”

হরিদাস ঠাকুর দাস তরঙ্গ ও শিল্পে উৎসাহীদের জন্য শিল্প সম্মেলন করেন এবং বৈদিক জ্ঞানের ওপর যুবকদের প্রবচন প্রদান করেন।

জিবিসি সদস্য এবং হরিদাস ঠাকুর দাসের পরমারাধ্য গুরুদেব বলেন, “এই প্রদর্শনীটিতে শ্রীল প্রভুপাদের বহু বিষয়

যথা দিব্য ধ্যানসমূহ আবেগ, ভাবপূর্ণ এবং মনোভাবগুলি প্রস্ফুটিত হয়েছে। কৃষ্ণপ্রাণীমূর্তি শ্রীল প্রভুপাদ আধুনিক জগতের জানালাটি আমাদের জন্য খুলে দিয়েছিলেন যা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির মাধ্যমে আমাদেরকে পরম আনন্দ দিতে পারে এবং সেগুলি হরিদাস ঠাকুর দাস তার রঙ ও তুলির মাধ্যমে অনবদ্যভাবে পরিস্ফুটিত করেছেন। এই প্রদর্শনীটি খুব দুর্দশাপূর্ণ অবস্থায় থাকা বর্তমান বিশ্বের শাস্তির জন্য নিবেদিত হয়েছে যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক শুদ্ধ ভক্তের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে।

মুস্টাই-এ প্রথম সূচিত হওয়া এই প্রদর্শনীটি হরিদাস ঠাকুর দাস তার অনবদ্য শিঙ্গ সন্তান আগামী কয়েক মাসে ভারতবর্ষের মুখ্য নগরগুলিতে প্রদর্শন করতে চান।

যুক্তরাজ্যের ভক্তরা ইউক্রেন সীমান্তে স্বেচ্ছাসেবা দান করছেন

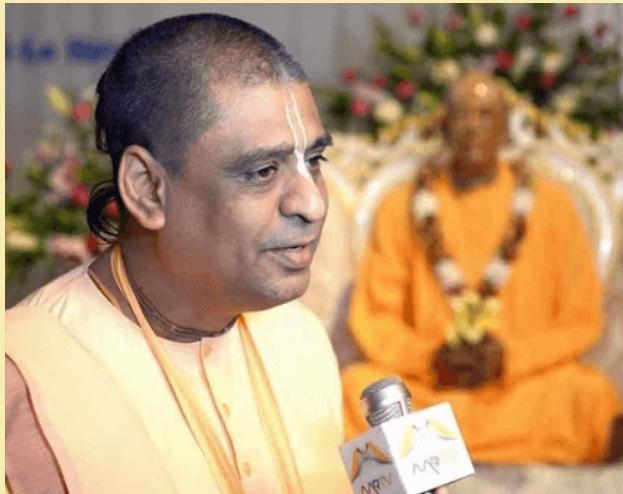


ভক্তিবেদান্ত ম্যানোর এবং লোটাস ট্রাস্টের যৌথ প্রচারে উৎসাহিত হয়ে এক বিপুল অনুদান সংগ্রহের ফল স্বরূপ মন্দির প্রবন্ধক প্রেমনিকেতন দাস, সুরক্ষা কর্মী লীলাজগন্নাথ দাস, কনগ্রিপ্রেশনাল কেয়ার অফিসার কানাইয়া দাস হাস্দেরী যাত্রা করেছেন। উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করা। এই একই দল পোলাণি এবং রোমানিয়া সীমান্তেও খুব সক্রিয় এবং তারা সাহায্যের নিমিত্ত ইউক্রেনেও প্রবেশ করছে।

বুদাপেস্ট থেকে দীর্ঘ পথ ভ্রমণের পর তারা রোমানিয়া এবং ইউক্রেনের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে দুই টন খাদ্য সামগ্ৰী নিয়ে পৌঁছেছেন। যদিও তাদেরকে সীমান্তে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে হবে কারণ ন্যাটোর সশস্ত্র সৈন্যরা সেখানে মজুত থাকার কারণে ইউক্রেন সরকার সেদেশের ভক্তদের সীমান্ত নিকটবর্তী স্থানে যেতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু রাত্রিকালে ভক্তরা এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ সহকারে রোমানিয়া সীমান্ত দিয়ে ইউক্রেনে প্রবেশ করে সেখানকার ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করে এসেছে।

প্রেমনিকেতন বলেন, “সেখানে ভক্তরা এই সমস্ত দ্রব্য পেয়ে খুব খুশি।” তারা বলেন এসবের খুব প্রয়োজন ছিল, কারণ কিছু কিছু ইউক্রেনীয় লোকের খাদ্যের অভাবে অনাহারে দিন কাটছিল।

শ্রীপাদ শ্রীবাস পণ্ডিত দাস প্রভুর তিরোধান



১৩ই মার্চ ২০২২ তোর বেলায় শ্রীবৃন্দাবনের পবিত্র ভূমিতে ৩টে ৪৯ মিনিটে শ্রীপাদ শ্রীবাস পণ্ডিত দাস দেহত্যাগ করেন। কীর্তনরত ভক্তরা সেই সময় তাঁর চারপাশে ছিলেন।

তিনি যাদেরকে শিক্ষা দান এবং লালন পালন করেন তাদের অনেকেই তাঁর এই প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত হন। ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি মায়ানমারে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের সূচনা করেন এবং সীমিত লোকবল ও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সেখানে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের বীজ বপন করেন। তিনি ইসকন মায়ানমারের আঞ্চলিক সচিব এবং সন্যাসী কমিটির একজন সদস্যরূপে সেবাদান করেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভু ভগবৎদর্শন পত্রিকার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃতে যোগদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের একটি প্রবচন শ্রবণের পরই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি তাঁর জীবন শ্রীল প্রভুপাদ ও ইসকনের সেবায় উৎসর্গ করবেন।

ইসকন মায়ানমার যাত্রার নেতৃত্ব দান ছাড়াও তিনি বহু গ্রন্থ যথা ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্বাগবতম, চৈতন্যচরিতামৃত এবং অন্য অনেক ছোট গ্রন্থ মায়ানমারের স্থানীয় ভাষা বার্মিজে অনুবাদ করেন। তাঁর বার্মিজ ভাষাতে অনুদিত চৈতন্যচরিতামৃত এই বছর গৌরপূর্ণিমাতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁর নিবেদন রাপে প্রকাশিত হয়।

যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন সকলকেই তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতে যুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। তার নিষ্ঠা এবং পরোপকারের প্রবৃত্তি বহু মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর জীবনধারা এবং প্রচার আমাদেরকে নিরস্তর স্মরণ করিয়ে দেয় যে তিনি চমৎকার এবং দৃষ্টান্তমূলক ভাবে শ্রীল প্রভুপাদের অসীম করণণা বিতরণ করার নিরলস প্রয়াস করেছেন। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভু জয়যুক্ত হোন।



শরণাগতি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়

প্রসন্ন গৌরচন্দ্র দাস

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য।।

—“একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর এবং অন্য সকলেই তাঁর সেবক। তিনি যেভাবে নির্দেশ দেন, তাঁরা সেভাবেই নৃত্য (কর্ম) করেন।” (চে.চ.আদি-৫/১৪২)

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পালক, সখা এবং প্রভুর পে স্বীকার করে তাঁর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাপূর্ণ হওয়া শাশ্বত জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা। এই মানবজন্ম হঠাতে মিলে যায় না, এটা কেবলমাত্র ভগবন্তক্ষি লাভের জন্য জীবের প্রতি কৃপা করে ভগবান প্রদান করেছেন। মুকুন্দমালা স্তোত্রের ৪৩নং শ্লोকে বলা হয়েছে—

“জগদ্গুর কৃষ্ণ সবে করেন রক্ষণ।
কৃষ্ণ বিশ্বস্তর বিশ্ব করেন পালন।।
কৃষ্ণ হৈতে এই বিশ্ব হঞ্চাছে উদয়।
অবশ্যে এই বিশ্ব কৃষ্ণে হয় লয়।।
কৃষ্ণে বিশ্ব অবস্থিত, জীব কৃষ্ণদাস।
সদ্গতি প্রদাতা কৃষ্ণে করহ বিশ্বাস।।

জন্ম লয়েছ কৃষ্ণভক্তি করিবারে।
কৃষ্ণভক্তি বিনা সব মিথ্যা এ সংসারে।।

শ্রীমন্ত মহাপ্রভু বলেছেন—“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।” কিন্তু মায়ার প্রভাবে জীব নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে মায়ার দাসত্ব করছে। সুতরাং জীবগণ যাতে জগৎসংসারের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে ভগবন্মুখী হয় এবং ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্বন্ধ খুঁজে পায়, জীবের সুহাদ হিসাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সূর্যের মতো উজ্জ্বল “শ্রীমদ্ভগবদগীতা” প্রদান করেছেন। গীতায় কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও ভক্তির সমন্বয়ে যে পূর্ণসূর্য যোগধর্ম বর্ণিত হয়েছে তাকে বলা হয় ভাগবত ধর্ম—যার মূলকথা হল—

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ।।
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ।।

(শ্রীমদ্ভাগবত-১/২/২৮-২৯)

অর্থাৎ, “পরমাত্মা পুরুষোভূমই সমস্ত বেদের একমাত্র জানার বিষয় (গীতা-১৫/১৫); তিনিই যজ্ঞ-দান-তপস্যাদির ভোক্তা (গীতা ৫/২৯); তাহাতে চিন্ত সংযোগই যোগ (গীতা-৬-১৫); তাহাতে পরা ভক্তি জান (গীতা ১৩/১০); তাহার কর্মই পরম ধর্ম (গীতা ১১/৫৫); তিনিই জীবের পরম গতি (গীতা ৯/১৮)।”

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করাই হল মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধ্যনের জন্য অধিকার অনুসারে বিভিন্ন উপায় ও সাধনার কথা ভগবদগীতায় ভগবান বলেছেন। কিন্তু বিচার করলে দেখা যায় সেই সমস্ত সাধনের মধ্যে ‘ভক্তিযোগ’ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতির মতো সহজ সরল, সুখসাধ্য এবং নিশ্চয় সাধন আর অন্য কিছুই নেই। কেবলমাত্র ভক্তির (পূর্ণ শরণাগতি) মাধ্যমেই ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় এবং ভগবদ্বামে প্রবেশ করা যায়। ভক্ত্যা মাম অভিজানাতি.....বিশ্বতে তৎ অনন্তরম্” (গীতা ১৮/৫৫)। ভগবদগীতায় উপদেশের আরম্ভ ও শেষ দুটোই ‘শরণাগতি’ করা হয়েছে। প্রথমে অর্জুন (২/৭)---“শিষ্যস্তেহহং সাধি মাঃ ত্বাঃ প্রপন্নম্”—আমি আপনার শিষ্য, শরণাগত, আমাকে যথার্থ উপদেশ দিন।—একথা বলেছেন। তখন ভগবান উপদেশ দিতে শুরু করেন এবং শেষ কালে উপদেশের সংহার করে বলেছেন—“হে অর্জুন!

পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হও। তাঁর প্রসাদে তুমি পরা শান্তি এবং নিত্যধার প্রাপ্ত হবে।” (গীতা-১৮/৬১, ৬২)। “সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।” (গীতা-১৮/৬৬)। এর মাঝেও কথা প্রসঙ্গে ভগবান শরণাগতিকে সব থেকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন—“বৃহজ্ঞের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্বকারণের পরম কারণেরপে জেনে আমার শরণাগত হন।” (গীতা-৭/১৯)। “হে পার্থ! যারা আমাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করে তারা স্তু, বৈশ্য, শুন্দ, আদিনীচকুলে জাত হলেও অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।” (৯/৩২)। “এভাবেই মৎপরায়ণ হয়ে সম্পূর্ণরূপে আমাতে অভিনিবিষ্ট হলে নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে লাভ করবে।” (৯/৩৪)

কিন্তু বিচারণীয় বিষয় হল এই যে, শরণাগতি বলতে বাস্তবে কি বোঝায়? শুধু মুখ দিয়ে “হে ভগবান, আমি আপনার শরণাগত”—উচ্চারণ করলেই শরণাগতি হয় না। শরণ নেওয়ার প্রকৃত অর্থ শরীর-মন-বাক্য দ্বারা নিজেকে

সর্বতোভাবে ভগবানে অর্পণ করা। সচিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর লিখেছেন—

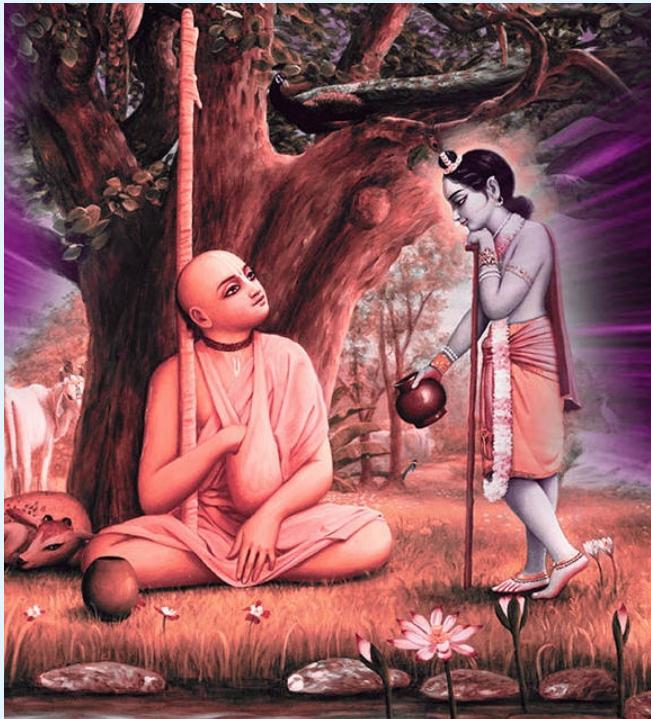
মানস, দেহ, গোহ, যো কিছু মোর।
অর্পিলু তুয়া পদে, নন্দকিশোর।।
সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে।
দায় মম গেলা, তুয়া ও পদবরণে।।
মারবি-রাখবি যোহিছা তোহারা।।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা।।

ভগবান প্রদত্ত প্রতিটা পরিস্থিতিতে তাঁর কৃপা দর্শন করে সম্প্রৱে অনুভব করে প্রসন্ন থাকা এবং তাঁকে স্মরণ করে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা—এর নাম শরণাগতি। সম্পূর্ণ জগত সেই পরমেশ্বর ভগবানের, তিনিই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেন, তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই প্রভু—“ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরং” (গীতা-৫/২৯)। তিনিই

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর এবং তাঁর সৃষ্টির সমস্ত রহস্য প্রকাশ করেছিলেন তাঁর প্রিয় সখা, ভক্ত এবং শরণাগত শিষ্য অর্জুনের কাছে—“যেহেতু তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, সেই হেতু সবচেয়ে গোপনীয় পরম উপদেশ তোমার হিতের জন্যই বলছি।” (গীতা-১৮/৬৪)। অর্জুন কিন্তু সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ব্যাসদেব শ্রেষ্ঠ, সবরকম সাংসারিক জ্ঞানে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির শ্রেষ্ঠ, স্বত্ববগত শৌর্যে ও পরাক্রমে মহারথী কর্ণ শ্রেষ্ঠ, ভক্তিতে উদ্বৰ ও অক্ষুর শ্রেষ্ঠ।

আমাদের কর্মবশতঃ যে রকম পরিস্থিতি পাওয়া উচিত সেইভাবে সৃষ্টি করে তাঁর নিজের কিছু বস্তুর দেখাশোনার ও যত্নের ভার দিয়েছেন এবং আমাদের জন্য কর্তব্য কর্মের বিধিও জানিয়েছেন। কিন্তু আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ ভগবানের বস্তুগুলো নিজের মনে করে নিয়েছি এবং সেগুলো কিছুতেই ছাড়তে চাই না, তাই আমাদের এত দুগতি। আমরা যদি আমাদের মোহ ত্যাগ করে ভগবানের দেওয়া সমস্ত কিছু ভগবানের সেবায় নিবেদন করি, তাহলে ভগবান আমাদের বিশ্বস্ততায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন। তিনি কৃপা করে আমাদেরকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করবেন—“মামেব যে প্রপদ্যস্তে মায়াম্ এতান্ত তরস্তি তে” (গীতা-৭/১৪); আমাদের তাঁর নিজস্ব চিন্ময় ভদ্বদ্বামে প্রবেশ করার অধিকার দেবেন।

এটাই হল প্রকৃত সমর্পণ—“ত্বদীয় বস্তু গোবিন্দ সমর্পয়ামি তুভ্যম্”—এইভাবে সর্বস্ব ভগবানের বলে তাঁকে অর্পণ করতে পারলে নিজের জন্য আর কোনও চিন্তা থাকে না,



সমস্ত চিন্তায় মধ্যে আমার শরণাগত ভক্তদের সমস্ত অপ্রাপ্ত বস্তু আমি বহন করি এবং তাদের প্রাপ্ত বস্তু সংরক্ষণ করি।” (গীতা-১/২২)

“আমাতে আবিষ্টিত্বে সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার-সাগর থেকে অচিরেই উদ্ধার করি।” (গীতা-১২/৭)

“তাঁরা আমার প্রসাদে আমার নিত্য অব্যয় ধাম লাভ করেন।” (গীতা-১৮/৫৬)

“আমার প্রসাদে সমস্ত প্রতিবন্ধক থেকে উন্মোচন হবে।” (গীতা-১৮/৫৯)

“আমি তাঁদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব।” (গীতা-১৮/৬৬)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু (যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ) আমাদেরকে শরণাগতির শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভক্তরূপে অবর্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষান্তকর্মে বলেছেন—

“এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ করুন, অথবা আদর্শনন্দনার মর্মান্ত করুন, তিনি লম্পট পুরুষ আমার সঙ্গে যেরকম আচরণই করুন না কেন, তিনি সর্বদা আমারই প্রাণনাথ।” (৮)

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর ‘ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ’ গ্রন্থে ‘শরণাগতির’ ৬টি লক্ষণ বর্ণনা করেছেন—(১) শ্রীকৃষ্ণের সেবার অনুকূল সমস্ত কিছু গ্রহণ করা। (২) শ্রীকৃষ্ণের সেবার প্রতিকূল সমস্ত কিছু বর্জন করা। (৩) সমস্ত পরিস্থিতিতে

শ্রীকৃষ্ণ আমায় রক্ষা করবেন —এই বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। (৪) নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল হওয়া। (৫) শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতিই আগ্রহী না হওয়া। এবং (৬) শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সর্বদা নষ্ট ও বিনীত থাকা।

শ্রীল প্রভুপাদ শরণাগতি (পূর্ণ আত্মসমর্পণ) সম্বন্ধে খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন—“একটা পশ্চিমে বাজার থেকে কিনে আনলে পশ্চিম তার মালিকের কাছে যেতাবে আত্মসমর্পণ করে, ভগবানের কাছে আমাদেরও সেতাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। সেই পশ্চিম তার কোন কিছু প্রয়োজনের জন্য উদ্বিগ্ন হয় না, সে জানে যে তার মালিক তার জন্য ব্যবস্থা করবে। তেমনি, একজন সম্পূর্ণরূপে শরণাগত আত্মা কোন কিছুর জন্য কখনোই উদ্বিগ্ন হন না।”

সর্বশক্তিমান ভগবানের ইচ্ছাক্রমে জীবনকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের আশ্রিত হয়, তখনই সে সবচাইতে সুখী হয়। জীবের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ হচ্ছে তার মিথ্যা অহংকার (আমি কর্তা), যা তাকে ভগবান থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মানুষের কর্তব্য সমস্ত অবস্থাতেই ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর এবং তাঁর সৃষ্টির সমস্ত রহস্য প্রকাশ করেছিলেন তাঁর প্রিয় সখা, ভক্ত এবং শরণাগত শিষ্য অর্জুনের কাছে—“যেহেতু তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, সেই হেতু সবচেয়ে গোপনীয় পরম উপদেশ তোমার হিতের জন্যই বলছি।” (গীতা-১৮/৬৪)। অর্জুন কিন্তু সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ব্যাসদের শ্রেষ্ঠ, সবরকম সাংসারিক জ্ঞানে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির শ্রেষ্ঠ, স্বভাবগত শৌর্যে ও পরাক্রমে মহারথী কর্ণ শ্রেষ্ঠ, ভক্তিতে উদ্বিগ্ন ও অত্মুর শ্রেষ্ঠ। অথচ অর্জুনকেই শ্রীকৃষ্ণ নির্বাচন করেছিলেন গীতার উপদেশ প্রদান করার জন্য। এটা পুরুণোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অথবা মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেবের অন্যায় পক্ষপাত নয়। এই যোগ্যতা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং আত্মসমর্পণের ফল। যিনি ভগবানের উপর পূর্ণ শ্রদ্ধা ও নির্ভরশীল হয়ে কোনও দাবী না করে নিজেকে শুভ-অশুভ, মঙ্গল-অমঙ্গল, পাপ-পুণ্য ইত্যাদির সমস্ত ভাব তাঁকে সমর্পণ করেন; নিজ প্রিয় কর্মে আসক্ত না হয়ে তাঁর আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে ইচ্ছুক হন; নিজ প্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ না করে তাঁর প্রেরিত বৃত্তি গ্রহণ করেন; নিজ প্রশংসিত গুণ সাধ্বে আলিঙ্গন না করে তাঁর প্রদত্ত গুণ ও প্রেরণা তাঁর কাজে প্রযুক্ত করেন—তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হন এবং ভগবৎ কৃপা লাভ করেন।

কঠোপনিষদেও (১/৩/২৩) বলা হয়েছে—

“নায়মাত্তা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহনা শৃঙ্গেন।
যমেবেষ বৃগুতে তেন লভ্যস্ত্রৈষ্যেৰ আত্মা বিবৃগুতে তনুং স্বাম্॥

—এই পরমাত্মা দাশনিকের ব্যাখ্যা দ্বারাও লভ্য নহে, মেধাশক্তি দ্বারাও লভ্য নহে, বিস্তর শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাও লভ্য নহে। ভগবান যাঁকে বরণ করেন তাঁরই লভ্য। যিনি ভগবানের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা, বিশ্বাস রেখে তাঁর নিকট আত্মসমর্পন করেন, নিজের বুদ্ধি বা কর্মের উপর ভরসা না করে সর্বদা তাঁর কৃপানির্ভর হয়ে অপেক্ষা করেন, সেই কৃপা নির্ভর ভক্তকে পরমাত্মা কৃপা করেন এবং মায়ার পর্দা সরিয়ে তাঁর সামনে নিজ স্বরূপ প্রকট করেন।”

সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন, কিন্তু আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে ভগবান স্বয়ং গুরু, রক্ষক ও সুহৃদ হয়ে সাধনপথে অগ্রসর করিয়ে দেন। কৃষ্ণের কৃপায় সদ্গুরু লাভ হয় এবং গুরুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় যা আমাদের কৃষ্ণের কাছে পৌঁছে দেবে। সাধারণ মানুষ যেহেতু ইন্দ্রিয় ও

মনকে সংযত করতে অসমর্থ হন সেইজন্য তাদের একমাত্র কর্তব্য হল ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের (সদ্গুরুর) শ্রীচরণারবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করে অক্ষিম সেবা দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা। শ্রীগুরুদের সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমেই কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ হয়—

যস্য প্রসাদাঽভগবৎপ্রসাদো

যস্য অপ্রসাদাঽন গতিঃ কুতোহপি

ধ্যায়ংস্ত্রবৎস্ত্রস্য যশস্ত্রি-সন্ধ্যং

বন্দে গুরো শ্রীচরণারবিন্দম্॥

(শ্রীশ্রীগুরুবন্ধুকম-৮)

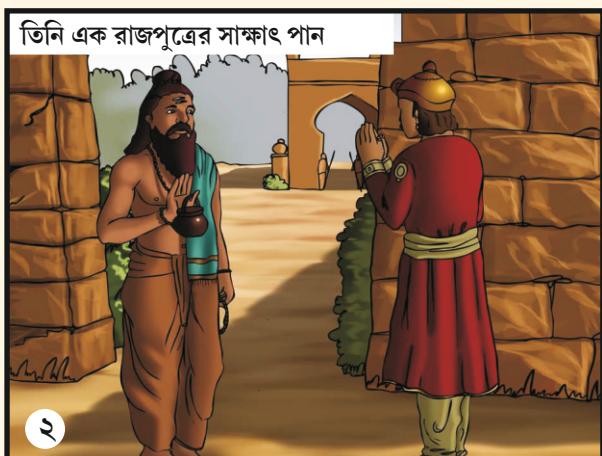
—“শ্রীগুরুদের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভ হয়।

শ্রীগুরুদের কৃপা ছাড়া কোনরকম আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। শ্রীগুরুদের অপ্রসন্ন হলে জীবের কোথাও গতি নেই। আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদের কীর্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করতে করতে তাঁর পাদপদ্ম বন্দনা করি।”



সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ

শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষামূলক গল্প হতে সংগৃহীত





উপদেশ - যারা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় ভোগবাসনা করে তারা সর্বদাই ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে লিপ্ত থাকে। কখনো মরতে চায় না। সাধারণত রাজার পুত্রের প্রভূত ধন সম্পদ থাকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য তাই সাধু তাকে চিরজীবী হওয়ার আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন, যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবে কিন্তু মৃত্যুর পর নরকে যাবে। যেহেতু ব্ৰহ্মাচারী কৃচ্ছসাধন ও কঠোর তপস্যা করে ভগবানের কাছে ফিরে যাবার জন্য তাই সাধু তাকে তৎক্ষণাত্ম মৃত্যুর আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন যাতে আর পরিশ্রম না করতে হয় এবং ভগবানের নিকট সে ফিরে যায়। যেহেতু একজন শিকারী নিরীহ পশু হত্যার কারণে এক ভয়কর জীবন যাপন করে তার ফলে মৃত্যুর পর সে নরকে যাবে তাই সাধু তাকে উপদেশ দিলেন তুমি বাঁচবেও না, আবার মরবেও না। কিন্তু একজন সাধু বাঁচতেও পারে আবার মরতেও পারে কারণ সে যখন বেঁচে আছে তখনও ভগবানের সেবা করছে এবং মৃত্যুর পরও সে ভগবানের সেবা করবে। তাই সাধুটির এ জীবন এবং পরবর্তী জীবন সমান কারণ উভয় সময় তিনি ভগবানের সেবাতে নিয়োজিত থাকেন।

রাজপুত্র চিরঞ্জীব মা জীব মুনিপুত্রক।
জীব বা মরো সাধু মা জীব মা মরো ইতি।।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମିଶ୍ର ବଲନା

নমস্তে নরসিংহায়	প্রত্বাদাত্তাদ-দায়িনে ।
হিরণ্যকশিপোবৰ্ক্ষ	শিলাটক্ষ-নখালয়ে ॥
নমো নমো নমো	নরসিংহদেব
প্রভু হে শ্রীভগবান ।	
ভক্ত প্রবর	প্রত্বাদ অন্তরে
আত্মাদ করহ দান ॥	
দুর্দান্ত অসুর	হিরণ্যকশিপু
বক্ষ যাহার পাযাগ ।	
পাযাগ বিদারী	অসি নিদারণ
তব নখ শোভমান ॥	
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহে	
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ	
বহিন্সিংহে হৃদয়ে নৃসিংহে	
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥	
সম্মুখে পশ্চাতে	তুমি সর্ব দিকে
থাকো সদা নরহরি ।	
যখনে যেখানে	তুমি সর্ব স্থানে
বাহিরে অন্তরে স্মারি ।।	
পরম আরাধ্য	পুরাণ পুরুষ
নরসিংহ ভগবান ।	
তোমার শরণ	যাচে অভাজন
করহ ভক্তিমান ॥	

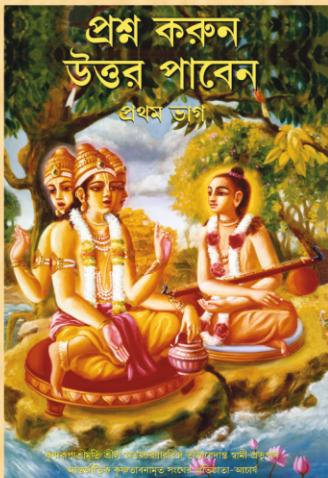


বাগীশা যস্য বদনে
 লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি ।
 যস্তাত্ত্বে হৃদয়ে সম্বিধ
 তৎ নৃসিংহমহং ভজে ॥
 সরস্বতী তব
 বুকেতে কমলা রাহে ।
 দিব্য জ্ঞান হৃদে
 নিয়ত স্ফুরয়ে
 দাসে তোমা আরাধয়ে ।।
 জয় নৃসিংহ শ্রীনৃসিংহ
 জয় জয় জয় শ্রীনৃসিংহ ॥
 উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং
 জ্বলন্তং সর্বতোমুখম্ ।
 নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং
 মৃত্যোর্মৃত্যুং নমাম্যহম্ ॥
 জয় জয় জয়
 নরসিংহদেব
 সর্বজয় ভগবান ।
 সকল দিকের
 প্রজ্বলনকারী
 তুমি বীর মহীয়ান ॥
 ভয়ানক তুমি
 উগ্ররূপধারী
 মৃত্যুরও তুমি ভয় ।
 নমি মহাবিষ্ণুং
 নরসিংহদেব
 পরম মঙ্গলময় ॥

অনুবাদঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

প্রকাশিত হয়েছে

কয়েক হাজার নিদারণ প্রশ্ন এবং সহজ সুন্দর উত্তর সম্বলিত অত্যন্ত আকর্ষণীয় গ্রন্থ



প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন

(প্রথম ভাগ)



প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন

(দ্বিতীয় ভাগ)

এই দুটি গ্রন্থে রয়েছে আপনার সত্য জিজ্ঞাসু মনের
মণিকোঠায় জেগে ওঠা হরেক প্রশ্নের সমাধান !

আজই সংগ্রহ করুন

* এই সকল গ্রন্থের জন্য যোগাযোগ করুন আপনার নিকটবর্তী ইসকন কেন্দ্র কিংবা সংকীর্তন প্রচার বাসগুলোতে।



ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

বৃহৎ মৃদুপ ভবন

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ৭৪১৩১৩